মার্কস ও মুক্তি

টেরি ইগলটন

ভাষান্তর

জাভেদ হুসেন

প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যতাত্ত্বিক, সমালোচক এবং বুদ্ধিজীবী
টেরি ইগলটন এই বইটি লিখেছেন কার্ল মার্কসের
চিন্তার রূপরেখা হিসেবে।
মূল রচনা হতে প্রসঙ্গ ধরে ধারাবাহিকভাবে মার্কসের চিন্তার
বিশ্লেষণ ও আলোচনা বইটিকে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক
করেছে। সেই সাথে মার্কসের চিন্তার নামে সম্পূর্ণ
মার্কস-বিরোধী যেসব চিন্তা চালু আছে, সেগুলো স্পষ্টভাবে
এখানে তুলে ধরা হয়েছে।
মার্কসের উদ্দেশ্য জগতকে বদল করা।
তাই বলে তিনি চিন্তার জায়গায় ভাবনাহীন কাজকে বসানোর
কথা বলেন নি। ইগলটন এই কথা ভুলে যান নি।
জগতকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অনুধাবনের যে প্রস্তাবনা
মার্কস হাজির করেছেন, এই গ্রন্থ সেই পাঠের এক
চমৎকার সূত্রপাত।

দাম : একশত বিশ টাকা

''হেগেল ও এরিস্টটল দার্শনিক ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্ল মার্কস কোন অর্থে দার্শনিক? ... তিনি দার্শনিক মনের প্রতি তীব্র শ্লেষ ছুঁড়ে দিয়েছেন ... ।
...তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, "দার্শনিকরা কেবল জগতকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আসল কাজ হল একে বদলানো"। পালটা কেউ একথা বলতেই পারেন, যে জগতকে বুঝলাম না তাকে পালটানোর কাজটা সহজ হবে না।
...চিন্তার জায়গায় ভাবনাহীন কাজ বসিয়ে দেয়ার কথা মার্কস বলেন নি। তিনি এমন একটা হাতে-কলমের দর্শন চালু করতে চেয়েছেন যা সেই দর্শন যাকে বুঝতে চাইছে তাকে রূপান্তর করতে সাহায্য করবে। মার্কস যখন চেতনা এবং বস্তু জগতকে এক সঙ্গে বাঁধতে চাইছেন, তার এক রাজনৈতিক অর্থ আছে।
... মার্কসের কাছে আমরা তখনই সবচেয়ে বেশি মানবিক এবং সবচেয়ে কম জান্তব যখন আমরা কোন প্রত্যক্ষ বস্তুগত চাহিদার থেকে স্বাধীন হয়ে মুক্ত, উদারভাবে উৎপাদন করি। মুক্তি মার্কসের কাছে বস্তুগত আবশ্যিকতা ছাপিয়ে এক সৃজনশীল অতি প্রাচুর্যতা। এই সৃজনশীলতা হিসেবের গণ্ডি ছাপিয়ে গিয়ে নিজেই নিজের মানদণ্ড হয়ে ওঠে।''

প্রচ্ছদ : হাসান মারুফ

টেরি ইগলটন ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ এ আইরিশ শ্রমিক পরিবারে জন্ম। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মার্কসীয় রাজনীতিতে হাতেখড়ি। অক্সফোর্ডে তিনি একটি র‍্যাডিকেল গ্রুপ গড়ে তোলেন। বর্তমানে ইংল্যান্ডের ল্যানকেসটার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। এর আগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ে অধ্যাপক ছিলেন।

সাহিত্যতাত্ত্বিক, সমালোচক ও বুদ্ধিজীবী টেরি ইগলটন চল্লিশটিরও বেশি বই লিখেছেন। পোস্টমডার্নিজমের অন্যতম পর্যালোচক হিসেবে বিশ্বব্যাপী তাঁর খ্যাতি রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: *লিটারেরি থিউরি: অ্যান ইনট্রোডাকশন (১৯৮৩)*; *দি ইডিওলজি অব এসথেটিকস (১৯৯০)*;
দি ইলিউশন অব পোস্টমডার্নিজম (১৯৯৬)।

তাঁর *মার্কসবাদ ও সাহিত্যতত্ত্ব (১৯৭৬)* বইটি বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পরিচিত।

আলোকচিত্র : ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

টেরি ইগলটন

মার্কস ও মুক্তি

ভাষান্তর

জাভেদ হুসেন

বাংলাদেশ অনুবাদ সংসদের পক্ষে

১৪২৩

মার্কস ও মুক্তি

প্রথম বাংলা সংস্করণ
মাঘ ১৪২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রকাশক
বাংলাদেশ অনুবাদ সংসদের পক্ষে
সংহতি প্রকাশন
৩০৫, রোজ ভিউ প্লাজা, তৃতীয় তলা
১৮৫ বীরউত্তম সি আর দত্ত রোড, হাতিরপুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৫
শো-রুম ১২৯ কনকর্ড এম্পোরিয়াম, নিচতলা, কাটাবন, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
হাসান মারুফ

অক্ষর বিন্যাস
কাওছার আলী

মুদ্রণ
খন্দকার প্রিন্টার্স, ২৭ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

দাম
পেপারব্যাক একশত বিশ টাকা বিদেশে ৪ ডলার
বোর্ডবাঁধাই একশত ষাট টাকা বিদেশে ৫ ডলার

MARX AND FREEDOM by TERRY EAGLETON
Translated by JAVED HUSSEN
Published by Samhati Prokashan (Samhati Publications)
on behalf of Bangladesh Anubad Samsad (Bangladesh Translation Society)
For information, address Samhati Publications, 305 Rose View Plaza 2nd Floor
185 Biruttam C R Dutta Road, Hatirpul, Dhanmondi, Dhaka-1205, Bangladesh.
E-mail: samhatiprokashan@yahoo.com www.samhati.com
Cover Design Hasan Maruf, Paperbcak 120.00 Taka / US $ 4.00
Boardbinding 160.00 Taka / US S 5.00

ISBN 978 984 888 269 6

সূ চি প ত্র

প্রকাশনা প্রসঙ্গে

বিশ্বজুড়ে কার্ল মার্কসের চিন্তা শতকোটি মানুষের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। কেন, তা উপলব্ধি করতে টেরি ইগলটনের মার্কস ও মুক্তি বইটি প্রাণবন্ত একটি পাঠপ্রবেশ। ইগলটন তাঁর কালের একজন অন্যতম মার্কস পর্যালোচক। অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠায় বিশাল বিষয়ের পরিধিকে তিনি চিত্তাকর্ষক গদ্যে খোদ মার্কসের বয়ানেই তুলে ধরেছেন। মার্কসের চিন্তার যত প্রবেশিকা আছে, এই ছোট বইটি তার মাঝে অন্যতম।

উদ্বৃত্ত মূল্য, বিচ্ছিন্নতা, পণ্য পূজাসহ মার্কসের চিন্তার মূল দিকগুলো তুলে ধরতে গিয়ে তিনি পাঠকের নিজ অনুসন্ধানের স্পৃহাকে জাগিয়ে তোলাকে মূখ্য উদ্দেশ্য করেছেন। এই পরিসরের ভেতরেই তিনি মার্কসের মূল ধারণা উপস্থাপনের সাথে, তাঁর নামে চালু কিছু ভ্রান্তিও দূর করার চেষ্টা করেছেন।

টেরি ইগলটন বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে সাহিত্য আলোচক হিসেবে ইতিমধ্যেই সুপরিচিত। জাভেদ হুসেনের মত একজন নিবিষ্ট অনুবাদক বিপুল শ্রম ও মগ্নতা নিয়ে এই ক্ষুদ্রকায় অথচ চিন্তার বিপুল রসদে পরিপূর্ণ গ্রন্থটির অনুবাদটি সম্পন্ন করেছেন,

তাঁকে বিশেষভাবে আমরা ধন্যবাদ জানাই। ইতিপূর্বে তার অনুবাদে কার্ল মার্কসের অন্য একটি গ্রন্থ 'ইহুদী প্রশ্নে' আমরা প্রকাশ করেছি।

মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা বিকাশের লক্ষে বাংলাদেশ অনুবাদ সংসদের নিয়মিত প্রয়াসের মাঝে বইটি একটি মূল্যবান সংযোজন হিসেবে পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমরা আশা করি। গ্রন্থটির প্রকাশনা ও বিতরণে সংহতি প্রকাশন আমাদের সহযোগী।

নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ অনুবাদ সংসদ
bdanubadsamsad@gmail.com

বাংলা সংস্করণ প্রসঙ্গে

'মার্কস ও মুক্তি' বিষয়ে টেরি ইগলটনের বই বাংলায় ভাষান্তরিত হয়ে ছাপা হচ্ছে, এই ব্যাপারটাই চিন্তার বিভিন্ন খোরাক দেয়।

প্রথমত, মার্কসকে নিয়ে কথা বলতে গেলে কোন রকম শ্রম বা কষ্ট না করেই ইচ্ছে মত মতামত দেয়ার দিন শেষ। মার্কসকে নিছক অর্থনীতিবাদী চিন্তার পরিসরের চাইতে ব্যাপক পরিসরে গ্রহণের সম্ভাবনা বাংলাভাষীদের মাঝেও কাজ করছে—এটাও বোঝা যাচ্ছে।

এই অধ্যয়ন কেবল পাঠের বৈচিত্র্যের কথা বলছে না। সেই সঙ্গে সমাজ রূপান্তরের ক্ষেত্রে আগ্রহী কর্মীদের চৈতন্যগত মাত্রার পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে।

অনেক ধারণা আমরা মার্কসের বরাতে বলে জানি। তার কিছু ঠিক নয় এবং মার্কসের ভাবনার সঙ্গে পরিচয় না থাকার চাইতেও যা ঝুঁকিপূর্ণ। এই সব দিক হতে মার্কসের মূল রচনা অধ্যয়নের অপরিহার্য কাজ সমষ্টিগতভাবে শুরু করা উচিত। সেই দিকে আমাদের নজর দেয়া দরকার।

ইগলটনের এই বই, একটি প্রয়াসের প্রস্তাবনা। মার্কসের

ভাবনা এখানে মার্কসের কথাতেই বলা হচ্ছে। পাঠক, আপনাকে স্বাগতম। অনেক বড় দুনিয়া অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

জাভেদ হুসেন
ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০১৬

লেখকের উৎসর্গ

স্টিভ রিগানের প্রতি

দর্শন

হেগেল ও এরিস্টটল দার্শনিক ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্ল মার্কস কোন অর্থে দার্শনিক? দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা যায় এমন লেখা মার্কস অনেক লিখেছেন। কিন্তু সেই সাথে তিনি দার্শনিক মনের প্রতি তীব্র শ্লেষ ছুঁড়ে দিয়েছেন এ কথাও সত্য। ফয়েরবাখ প্রসঙ্গে তাঁর সমাদৃত একাদশ থিসিসে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, "দার্শনিকরা কেবল জগতকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আসল কাজ হল একে বদলানো।" পালটা কেউ একথা বলতেই পারেন, যে জগতকে বুঝলাম না তাকে পালটানোর কাজটা সহজ হবে না। এ বিষয়ে মার্কসও নিশ্চয়ই একমত হতেন। চিন্তার জায়গায় ভাবনাহীন কাজ বসিয়ে দেয়ার কথা মার্কস বলেননি। তিনি এমন একটা হাতে-কলমের দর্শন চালু করতে চেয়েছেন যা, সেই দর্শন যাকে বুঝতে চাইছে তাকে রূপান্তর করতে সাহায্য করবে। সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন এক সঙ্গে চলে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন,

> 'সর্বহারার উৎকর্ষতা ছাড়া দর্শন নিজেকে বাস্তবায়িত করতে পারে না, আর দর্শনকে বাস্তবায়ন না করে সর্বহারা নিজেকে বাস্তবায়িত করতে পারে না।' (১৮৪৪)

ফয়েরবাখ প্রসঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় থিসিসে তিনি বলছেন:

> মানুষের চিন্তার বস্তুগত সত্য আছে কিনা এ প্রশ্ন তত্ত্বগত নয়, ব্যবহারিক। ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষকে তার চিন্তার সত্যতাকে অর্থাৎ বাস্তবতা ও শক্তিকে, ইহমুখিনতাকে প্রমাণ করতে হবে। ব্যবহার থেকে বিচ্ছিন্ন, চিন্তার বাস্তবতা ও অবাস্তবতা সংক্রান্ত প্রশ্ন নেহাতই পণ্ডিতি কুতর্ক। (ফয়েরবাখ প্রসঙ্গে থিসিস)

এই বিশেষ ধরনের কর্মভিত্তিক তত্ত্বকে কখনো *মুক্তির জ্ঞান* বলে ডাকা হয়। এই জ্ঞানের কয়েকটা বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে। এটা কারোর অবস্থার এক ধরনের উপলব্ধি। কোন ব্যক্তি বা দল যদি তার বহাল অবস্থা বদলাতে চায় তা হলে এই উপলব্ধি দরকার। ফলে এই জ্ঞান এক ধরনের নতুন আত্ম-উপলব্ধিও বটে। কিন্তু নতুন পথে নিজেকে জানার চেষ্টা করতে গেলে নিজেকেই বদলে ফেলতে হয়। এভাবে আমরা এখানে এক বিশেষ ধরনের চেতনার দেখা পাচ্ছি, যেখানে জানার চেষ্টা করতে গিয়ে যাকে জানতে চাচ্ছি তা পাল্টে যাচ্ছে। আমাকে এবং আমার অবস্থাকে জানার চেষ্টা করতে গেলে, আমি আর কখনো আমার সাথে একই রকম থেকে যেতে পারি না। কারণ যে আমি জানছে, সেই সাথে সে নিজেকেও জানছে, সে আর আগের মতো থাকে না। আর আমি যদি এই সবকিছু বুঝতে চাই, তাহলে সেই একই প্রক্রিয়া আবার শুরু হবে। এটা অনেকটা নিজেই নিজের ছায়ার ওপর লাফ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করবার মতো ব্যাপার। এই ধরনের জ্ঞান মানুষকে হাতে-কলমে তার অবস্থা পাল্টানোর দিকেও এগিয়ে নিয়ে যায়। ফলে সে নিজেই এক ধরনের সামাজিক বা রাজনৈতিক শক্তি হয়ে

যায়। যে বস্তুগত অবস্থাকে সে পরীক্ষা করছে, তাকে নিয়ে নিছক *ভাবনার* বদলে সে তার অংশ হয়ে যায়। নিছক বিমূর্ত জল্পনা-কল্পনার জায়গায় এই জ্ঞান এক ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে ওঠে। এখানে জানা ও জানার উপায়কে আর স্পষ্ট করে আলাদা করার কিছু থাকে না। তদুপরি, নিজেকে মুক্ত করতে চাওয়ার সঙ্গে মূল্যবোধের (value) প্রশ্ন জড়িত, যেখানে কিনা নিজের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া এক ধরনের বাস্তব তথ্যমূলক উপলব্ধির ব্যাপার। মজার বিষয় হলো, বাস্তব তথ্য আর মূল্যবোধের মাঝে দর্শন সাধারণত যে ফারাক মেনে নেয় এখানে তা আবছা হয়ে যাচ্ছে। এই রকমের জ্ঞান যে কেবল খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে কাজে লাগানো যায় শুধু তা-ই নয়, বরং উপলব্ধি করতে চাওয়ার প্রেরণার সঙ্গে যে মূল্যবোধের বোধ জড়িত, এটা একটা বড় ব্যাপার।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, ফয়েরবাখ প্রসঙ্গে ১১ নম্বর থিসিস জল্পনা-কল্পনা হতে *বাস্তব জগতে* ফিরে আসার কোন সংকীর্ণ আহ্বান নয়। তবে এটা ঠিক যে প্রথম দিকের মার্কসে বুদ্ধিবৃত্তিকতার বিরোধিতার ঝলক দেখা যায়। এই রকম আবেদন ভুলে যায় যে, বিমূর্ত ধারণা বাদ দিলে আমাদের জন্য কোন বাস্তব জগৎ থাকে না। মার্কসের ভঙ্গির পরিহাস হলো এই যে, তিনি এই দাবি শুধু রাজনৈতিক কর্মী নন বরং একজন দার্শনিক হিসেবেও তুলছেন। এভাবে বলা যায় যে, তিনি এক বিশিষ্ট *প্রতি-দার্শনিক* সিলসিলায় যোগ দিচ্ছেন যার মাঝে আছেন কিয়েের্কেগার্দ, নিৎশে, হাইডেগার, এডোর্নো, বেঞ্জামিন, ভিটগেন্সটাইন এবং আমাদের কালের জাক দারিদা ও রিচার্ড রোর্টির মতো ব্যক্তিরা। এদের কাছে মনে হয় যে তাঁদের কালের সমগ্র দার্শনিক উদ্যোগের মাঝেই

মৌলিক একটা গলদ আছে । তাঁরা বলছেন, দর্শনের ভেতরের অমুক-তমুক বিষয় নয়, খোদ দর্শন নিজেই এক গভীর সমস্যাসংকুল সাধনা হয়ে উঠেছে। এ জন্য, দর্শন যে সব কারণে আগ্রহোদ্দীপক সেই কারণেই তাঁরা দর্শনের পুরো প্রকল্পকে অতিক্রম করে যেতে চান। নয়তো চান এমন কোনো উপায় বের করতে যাতে একে আগাগোড়া ঢেলে সাজানো যায়, যার জন্য এই চিন্তাবিদদের অনেকেই নতুন ধাঁচের তাত্ত্বিক রচনা নির্মাণ করেছেন। তাঁদের অধিকাংশই দর্শনের অধিবিদ্যক ভণ্ডামি চুপসে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। সেই উদ্দেশ্যে চোরের ওপর বাটপারির মতো করে উপস্থাপিত হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে আরো মৌলিক কিছু, যেমন: সত্তা, ক্ষমতা, ব্যবধান, জীবনের ব্যবহারিক ধরন, অথবা মার্কসের ক্ষেত্রে *ঐতিহাসিক শর্ত*। এই রকম একজন প্রতি-দার্শনিকের দর্শন বিরোধিতা অনেকটা ইউলিসিসের প্রতি-উপন্যাসের মতো। জেমস জয়েস তো অ-উপন্যাস বলতে টেলিফোন ডিরেক্টরি বোঝাননি!

মার্কস দর্শনের প্রতি এত সংশয়ী কেন? একটা কথা বলতে হয়, তিনি দেখেছিলেন যে এটা শুরুই হয় ভুল জায়গা থেকে। দর্শন যথেষ্ট পেছন হতে শুরু হয়নি। তাঁর কালের চালু দর্শন যে ভাববাদ, তা শুরু হতো ভাব থেকে, চৈতন্য ছিল যার কাছে বাস্তবের ভিত্তি। কিন্তু মার্কস এই বিষয়ে সজাগ ছিলেন যে আমরা কোনো ভাব কব্জা করবার আগেই নিশ্চই আরো অনেক কিছু ঘটে যায়। কোনো কিছু নিয়ে আমরা ভাবতে বসার জন্য কোন্ ব্যাপারগুলো ঘটা অবশ্যই দরকার? আমরা যে জগৎ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, নিশ্চই আমরা ইতিমধ্যেই এই জগতের সঙ্গে ব্যবহারিকভাবে গাঁটছাড়া বেঁধে

ফেলেছি। আর তাই ঢুকে পড়েছি অনেকগুলো সম্পর্কের ভেতর যার মাঝে আছে বস্তুগত শর্ত, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, এইসব:

> বিভিন্ন ভাবের, ধারণার, চেতনার পয়দা হওয়াটা প্রথমে সরাসরি বিজড়িত থাকে মানুষের বৈষয়িক সক্রিয়তা এবং বৈষয়িক সংসর্গের সঙ্গে, যেটা হলো বাস্তব জীবনের ভাষা। মানুষের ধারণা করা, চিন্তন, মানসিক সংসর্গ এই পর্বে তাদের বৈষয়িক আচরণের সরাসরি নিঃসরণ বলে প্রতীয়মান হয়। কোনো লোকসমষ্টির রাজনীতি, আইন, নৈতিকতা, ধর্ম, অধিবিদ্যা ইত্যাদির ভাষায় যেমনটা প্রকাশ পায় সেই মানসিক উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মানুষ হল তাদের ধারণা, ভাব-ভাবনা ইত্যাদির উৎপাদক বাস্তব, সক্রিয় মানুষ, যেভাবে তারা রূপায়িত-অভ্যস্ত হয় তাদের উৎপাদন শক্তিসমূহ এবং সুদূরবর্তী আকারগুলি অবধি সেগুলির প্রতিসঙ্গী সংসর্গের একটা নির্দিষ্ট বিকাশ দিয়ে। চেতনা কখনো সচেতন অস্তিত্ব ছাড়া কিছু হতে পারে না, আর মানুষের অস্তিত্ব হলো তাদের প্রকৃত জীবন-প্রক্রিয়া। (*জর্মন ভাবাদর্শ* পৃ. ২৫-২৬)

একটা ব্যাপার লক্ষ করতে হবে। জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে, মার্কস যখন চেতনা এবং বস্তু জগৎকে এক সঙ্গে বাঁধতে চাইছেন, তার এক রাজনৈতিক অর্থ আছে। এই অর্থে তিনি সেই সম্পর্ক আলগা করে দিতে চান। আমরা দেখব যে, মার্কসের কাছে আমরা তখনই সবচেয়ে বেশি মানবিক এবং সবচেয়ে কম জান্তব, যখন আমরা কোনো প্রত্যক্ষ বস্তুগত চাহিদার থেকে স্বাধীন হয়ে মুক্ত, উদারভাবে উৎপাদন করি। মুক্তি মার্কসের কাছে বস্তুগতভাবে

আবশ্যিকতা ছাপিয়ে এক সৃজনশীল অতিপ্রাচুর্যতা। এই সৃজনশীলতা হিসেবের গণ্ডি ছাপিয়ে গিয়ে নিজেই নিজের মাপদণ্ড হয়ে ওঠে। সমাজে এমনটা ঘটার জন্য প্রথমেই কিছু নির্দিষ্ট বস্তুগত অবস্থা দরকার যাতে প্রকৃতির ওপর চৈতন্য লাভ হয়। মার্কস একে আমাদের মনুষ্যত্বের সিলমোহর বলে মনে করতেন। কিন্তু পরিহাসের ব্যাপার হলো, এই চৈতন্য একটা বস্তুগত শর্তাধীন অবস্থা। চৈতন্য এবং সামাজিক চর্চা যেখানে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে এক বিন্দুতে মিলিত হয়, মার্কসের কাছে সেই দৃষ্টান্ত হচ্ছে খোদ ভাষা:

> ভাষা হচ্ছে চৈতন্যের সমান বয়সী। ভাষা হচ্ছে ব্যবহারিক, বাস্তব চেতনা যা অপর মানুষদের কাছেও অস্তিত্বমান আর কেবল এ জন্যই তা তার জন্যও অস্তিত্বমান। চৈতন্যের মতো ভাষাও কেবল প্রয়োজন থেকেই জন্মলাভ করে। সেই প্রয়োজন হচ্ছে অপর মানুষের সঙ্গে মেলামেশার প্রয়োজন। (*ভাবাদর্শ*)

কিন্তু ভাষা যৌথ শ্রমের আবশ্যিক মাত্রা হিসেবে প্রয়োজন হতে জন্ম নিলেও তা সেই প্রয়োজনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। এর সবচেয়ে বড় সাক্ষী হচ্ছে সাহিত্য।

ব্যাপারটা যখন কেবল চৈতন্যের সীমা থেকে পদ্ধতিগত ভাবনা মানে দর্শনে এসে ঠেকে, তখন স্পষ্টতই প্রয়োজন পড়ে বিশেষজ্ঞ, একাডেমি এবং আরো একগাদা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের। আর এগুলো চালানোর জন্য শেষ পর্যন্ত দরকার হয় টাকা-পয়সার, যা যোগান দিতে পারে কেবল অন্যের শ্রম। মার্কস মানসিক এবং গায়ে

খাটা শ্রমের মাঝে যে বিভাজন বুঝিয়েছেন, এটা তার একটা প্রেক্ষিত। একটা সমাজ যখন বস্তুগত প্রয়োজনের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত যোগান দিতে পারে, যখন সেই সমাজ তার সদস্যদের একটা অংশকে উৎপাদনশীল শ্রম দেয়া থেকে মুক্তি দিয়ে পূর্ণকালীন রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক উৎপাদক ইত্যাদি হওয়ার সুযোগ দিতে পারে, কেবল তখনই দর্শন যথার্থ অর্থে বিকশিত হতে পারে। এখন চিন্তা এই কল্পনায় মশগুল হতে পারে যে সে বস্তুগত বাস্তবতার ধার ধারে না, কারণ:

> ভৌত আর মানসিক শ্রমের মধ্যে বিভাগ যখন দেখা দেয় সেই ক্ষণ হতে শ্রমবিভাগ হয়ে ওঠে সত্যিকারের শ্রমবিভাগ। তখন থেকে চেতনা যথার্থই এই আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে যে, সেটা বিদ্যমান চলিতকর্ম সম্বন্ধ ছাড়া অন্যকিছু, সে বাস্তব কিছুর স্থানাপন্ন না হয়েও বাস্তবিকই একটা কিছুর স্থানাপন্ন হচ্ছে; তখন থেকে চেতনা এমন অবস্থায় আসে যাতে সেটা নিজেকে বহির্জগৎ থেকে মুক্ত করে নিয়ে বিশুদ্ধ তত্ত্ব, ব্রহ্মবিদ্যা, দর্শন, নীতিবিদ্যা গড়তে এগোতে পারে। (*ভাবাদর্শ* পৃ. ৩৭-৩৮)

মার্কসের মতে, সংস্কৃতির একমাত্র জননী হচ্ছে শ্রম, তাঁর কাছে যা শোষণ শব্দের সমার্থক। শ্রেণি সমাজের সংস্কৃতি এই অনাহূত সত্য ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চায়। সে নিজের ছোট জাতের মায়ের কথা অস্বীকার করে কোনো অভিজাত পরিবারের স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে আর ভাবে যে তার জন্ম আরো অতীতের কোন সংস্কৃতি হতে অথবা শৃঙ্খলহীন কোনো ব্যক্তির কল্পনা হতে। কিন্তু মার্কস এই

কথা মনে করিয়ে দিতে চান যে, আমাদের শরীরের ইন্দ্রিয়ের মতোই আমাদের চিন্তাও আমাদের মোকাবেলা করা ইতিহাসের উৎপন্ন। ইতিহাস, মানে এই বাস্তব জগৎ, সব সময় তাকে বেঁধে ফেলতে চায় যে চিন্তা, তাকে কোনো না কোনোভাবে পিছে ফেলে যায়। আর মার্কস একজন খাসা দ্বন্দ্ববাদীর মতোই জিনিসের অগ্রসরমাণ, মিথস্ক্রীয়, বাধাহীন স্বভাবের ওপর জোর দেন। তিনি চিন্তার সেই সব দাম্ভিক পদ্ধতিগুলো মোটেই পছন্দ করেন না, যেগুলো হেগেলীয় ভাববাদের মতো বিশ্বাস করে যে তারা কোনো না কোনোভাবে সমস্ত জগৎটাকে তাদের ধারণার মধ্যে জোড়াতালি দিয়ে আটকে ফেলতে পারবে। গভীর অনুতাপের বিষয় যে মার্কসের নিজের কাজও এক সময় তেমনই একটা বন্ধ্যা পদ্ধতির জন্ম দিল।

মার্কসের ক্ষেত্রে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে বস্তুগত কারণ এবং খোদ চিন্তার শর্তের। আমরা এটা-সেটার কারণ খুঁজে বেড়াতে পারি, কিন্তু সেই চিন্তা কি নিজেকে বুঝতে পারবে, মানে, সে কি তাকে উৎপাদন করেছে যে ইতিহাস তাকে বুঝতে পারবে? আমরা আধুনিকরা এই উদ্দেশ্য হয়তো কখনোই পুরোপুরি অর্জন করতে না পারার যথেষ্ট কারণ আছে। আমাদের সামনে সব সময়ই এক রকমের অন্ধবিন্দু থাকে, থাকে আবশ্যিক কোনো স্মৃতিবিভ্রম বা আত্ম-অসচ্ছতা। এগুলো নিশ্চিত করে দেয় যে, মন সব সময়ই শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টায় ব্যর্থ হবে। এনলাইটেনমেন্টের সন্তান হিসেবে মার্কস হয়তো আমাদের চাইতে বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। আমরা তো বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোর মাঝে ডুবে আছি। ইতিহাস আর

বুদ্ধিবাদিতার দুই স্রোত মার্কসের কাজের মাঝে প্রায়শই চাপা উত্তেজনা বজায় রাখত। একজন ইতিহাস চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি মেনে নিয়েছেন যে যদি সমস্ত চিন্তাই ঐতিহাসিক হয় তবে অবশ্যই তাঁর নিজ চিন্তার ক্ষেত্রেও তা সত্য। শার্লেমেন বা চসারের আমলে কোনো মার্কসবাদ থাকা সম্ভব ছিল না, যেহেতু মার্কসবাদ এমন কোনো উজ্জ্বল একগুচ্ছ সত্য নয় যা যে কেউ, যে কোনো কালে চিন্তা করে বের করে ফেলতে পারে। মার্কসবাদ বরং কাল আর স্থানের অধীন ব্যাপার। সে স্বীকার করে যে, বিমূর্ত শ্রম, পণ্য, মুক্তভাবে চলাচলকারী ব্যক্তি এই রকম যে সব ক্যাটাগরি নিয়ে সে চিন্তা করে, খোদ এই ক্যাটাগরিগুলো পুঁজিবাদ ও রাজনৈতিক উদারতাবাদের ঐতিহ্য ছাড়া জন্ম নিত না। ডিসকোর্স হিসেবে মার্কসবাদের তখনই উত্থান ঘটেছে যখন পুঁজিবাদের ভেতরের পর্যালোচক হিসেবে তা সম্ভব ও প্রয়োজনীয় ছিল। মার্কসবাদ সেই কালেরই উৎপন্ন যাকে সে ছুঁড়ে ফেলতে চায়। মহান মধ্যবিত্ত বিপ্লবী শ্রেণি এবং মানব সম্ভাবনার সেই বিপুল শৃঙ্খলমোচক যাকে আমরা পুঁজিবাদ নামে চিনি, তাদের প্রশংসায় *কমিউনিস্ট ইশতেহার* কোনো কার্পণ্য করেনি:

> বুর্জোয়া শ্রেণি যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। যে সব বিচিত্র সামন্ত বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ ঊর্ধ্বতনদের কাছে, তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার নগদ টাকার বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখেনি। আত্মসর্বস্ব হিসাব-নিকাশের বরফজলে এরা ডুবিয়ে

> দিয়েছে ধর্ম-উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ ও কূপমণ্ডূক ভাবালুতা। এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমে যে শোষণ এতদিন ঢাকা ছিল, তার বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ পাশবিক শোষণ। বুর্জোয়া শ্রেণি পরিবারপ্রথা থেকে তার ভাবালু ঘোমটাটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে, পারিবারিক সম্বন্ধকে পরিণত করেছে একটা আর্থিক সম্পর্কে। উৎপাদনের উপকরণে অবিরাম বিপ্লবী বদল না এনে, এবং তাতে করে উৎপাদন সম্পর্ক ও সেই সঙ্গে সমগ্র সমাজ-সম্পর্কে বিপ্লবী বদল না ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণি বাঁচতে পারে না। আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হলো উৎপাদনে অবিরাম বিপ্লবী পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনা। অনড় জমাট সব সম্পর্ক ও আর আনুষঙ্গিক সমস্ত সনাতন শ্রদ্ধাভাজন কুসংস্কার ও মতামতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়, নবগঠিতগুলোকে দৃঢ়সম্বন্ধ হয়ে ওঠার আগেই অচল হয়ে আসে। যা কিছু ভারিক্কী তা-ই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, যা পবিত্র তা হয় কলুষিত। শেষ পর্যন্ত মানুষ বাধ্য হয় তার জীবনের আসল অবস্থা এবং অপরের সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে খোলা চোখে দেখতে। (*ইশতেহার*, ২৮-২৯, র. স ১)

একই সঙ্গে সমীহজনক আর বিধ্বংসী এই বিপ্লবী তেজ সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ভিত্তি স্থাপন করে আবার প্রতিটি মোড়ে তাকে হতাশ করে। পুঁজিবাদ সমস্ত প্রথাগত নিপীড়ন এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দেয় আর তা করতে গিয়ে মানবতাকে এক নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সমাজতন্ত্র তখন সেই নিষ্ঠুরতাকে

স্বীকার করে নিয়ে রূপান্তরিত করতে বাধ্য হয়।

যে বস্তুগত অবস্থাকে পরীক্ষা করা হবে খোদ তার মাঝেই চিন্তাকে শেকড় গাড়া অবস্থায় উপলব্ধি করতে হলে বস্তুবাদী দার্শনিক হতে হবে। বস্তুবাদী দার্শনিক আখ্যাটার মধ্যে যে কূটাভাস আছে তা একেবারে হাল্কা নয়। বস্তুবাদী চিন্তার কাজ হলো নিজের মাঝে সেই বাস্তবতাকে, মানে বস্তুগত জগৎকে হিসেব করা, যা খোদ চিন্তার বাইরে অবস্থান করে, আর যা কিছু অর্থে যে এর চাইতে মৌলিক তার খতিয়ান নেয়া। মার্কস দাবি করেন যে, মানব প্রজাতির ইতিহাসে *সামাজিক সত্তা* চৈতন্য নির্ধারণ করে, এবং ভাববাদীদের কথা অনুযায়ী উল্টোটা সঠিক নয়:

> নৈতিকতা, ধর্ম, অধিবিদ্যা, ভাবাদর্শের বাদবাকি সবটা এবং সেগুলির প্রতিসঙ্গী বিভিন্ন রূপের চেতনার স্বাতন্ত্র্যের চেহারাটা আর বজায় থাকে না। সেগুলোর নেই কোনো ইতিহাস, নেই বিকাশ। কিন্তু মানুষ তাদের বৈষয়িক উৎপাদন আর তাদের বৈষয়িক সংসর্গ সম্প্রসারিত করে বদলে ফেলে এটার সঙ্গে তাদের আসল অস্তিত্ব, তাদের চিন্তন এবং তাদের চিন্তনের উৎপাদ। জীবন চেতনা দিয়ে নির্ধারিত নয়, চেতনাই নির্ধারিত হয় জীবন দিয়ে। (*ভাবাদর্শ* পৃ. ২৬)

এখানেই মার্কসের সেই সুপরিচিত *মাথা নিচে পা ওপরে দিয়ে* দাঁড়িয়ে থাকা হেগেলের দর্শনের কথা বোঝা যাবে। মানে উলটো হয়ে দাঁড়ানো দ্বান্দ্বিকতা, ভাবনির্ভর সমাজ অস্তিত্বকে অবশ্যই এর নিজের বস্তুবাদী পায়ের ওপর শক্তভাবে দাঁড় করাতে হবে।

মার্কসের মতে, আমরা যা বলি বা ভাবি, তা শেষ পর্যন্ত আমরা যা করি তা দিয়েই নির্ধারিত হয়। আমাদের ভাষার খেলার তলার পাটাতন হলো ঐতিহাসিক অনুশীলন। তবে এখানে একটু সাবধান হওয়ার দরকার আছে। কারণ ঐতিহাসিক সত্তা হিসেবে আমরা যা করি তা অবশ্যই চিন্তা ও ভাষার সাথে গভীরভাবে বাঁধা আছে। মানে, অভিপ্রায়, কল্পনার রাজত্বের বাইরে কোনো মানব অনুশীলন নেই। মার্কস নিজে বলছেন:

> পশুদের জীবন-ক্রিয়া তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। তারা তাদের জীবন-ক্রিয়া হতে নিজেদের পৃথক করে না। এটাই তাদের জীবন-ক্রিয়া। মানুষ তার জীবন-ক্রিয়া গড়ে নেয় নিজ ইচ্ছা ও চৈতন্যের বিষয় হিসেবে। তার রয়েছে সচেতন জীবন-ক্রিয়া। এটা এমন কোনো নির্ধারণ নয় যার সাথে সে সরাসরি মিশে যায়। (১৮৪৪)... মাকড়সা যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে তার সঙ্গে তাঁতির কাজের সাদৃশ্য আছে, এবং মৌমাছি তার মৌচাক নির্মাণের কারিগরিতে অনেক স্থপতিকেই লজ্জা দেয়। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ মৌমাছির থেকেও সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থপতির তফাত এইখানেই যে স্থপতি প্রথমে কল্পনায় তার ইমারত তোলে তারপর বাস্তবে সেটিকে গড়ে তোলে। (*ক্যাপিটাল*, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ.৫৯, মস্কো)

সামাজিক সত্তা চিন্তার জন্ম দেয়, তবে তা করে সে নিজেই এর মাঝে আটকা পড়ে। তবুও, মার্কস দাবি করতে চান যে সামাজিক সত্তা বেশি মৌলিক। একইভাবে তিনি দাবি করতে চান যে সমাজের বস্তুগত ভিত্তি সমাজের সাংস্কৃতিক, আইনি, রাজনৈতিক

এবং ভাবাদর্শিক *উপরিকাঠামোর* জন্ম দেয়:

> মানব-জীবনের সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে মানুষ জড়িত হয় কতগুলি অনিবার্য ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে, উৎপাদন-সম্পর্কে, যা মানুষের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের অনুরূপ। এই উৎপাদন সম্পর্কগুলির সমষ্টি হলো সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, সেই আসল বনিয়াদ, যার ওপর গড়ে ওঠে আইনগত আর রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপগুলো হয় তারই অনুরূপ। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন পদ্ধতিই সাধারণভাবে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন-প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক বিপরীতভাবে, মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারিত করে তার চেতনাকে। (*অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে*, ভূমিকা, ২৫, র.স. ২)

এই তাহলে মার্কসের বহু সমাদৃত *ইতিহাসের অর্থনৈতিক* তত্ত্ব। সামাজিক সত্তা এবং চৈতন্যের যে অগ্রাধিকার তিনি দাবি করেন তা *সত্তাতত্ত্বীয়*। মানবসত্তাকে তিনি যেভাবে গ্রহণ করেন, এর সম্পর্ক তার সাথে। ভিত্তি/উপরিকাঠামোর তত্ত্বও তাহলে এমন হতে পারে: সকল সামাজিক এবং রাজনৈতিক রূপ এবং সমস্ত প্রধান ঐতিহাসিক পরিবর্তন চূড়ান্ত বিচারে বস্তুগত উৎপাদনের মাঝের সংঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। তবে এই তত্ত্বটাকে আরো ঐতিহাসিকভাবে দেখা যেতে পারে, শ্রেণি সমাজে রাজনীতি, আইন, ভাবাদর্শ এবং আরো সব যেভাবে চলে সেই নিরিখে। মার্কসের কথাটা হলো যে, মোদ্দা কথায় এই রকম সমাজ ব্যবস্থায়

সমাজ সম্পর্কের ভিত্তিটা যেহেতু অ-ন্যায্য ও পরস্পরবিরোধী, সেহেতু এই রূপগুলো (রাজনীতি, আইন, ভাবাদর্শ, ইত্যাদি) এই অন্যায্যতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি, উৎসাহ বা লুকিয়ে রাখার কাজটা করে। আর এই অর্থে একথা বলা যায় যে, তারা গৌণ বা *উপরিকাঠামোগত*। এখানে তাহলে এমনও তাৎপর্য হতে পারে যে, যদি সামাজিক সম্পর্ক ন্যায্য হতো, তাহলে ওই সব উপরিকাঠামোর দরকারই থাকত না। অন্যভাবে বললে, এখানে আমাদের ভাবের শুধু বস্তুগত উৎস নিয়ে ভাবলে চলছে না, ভাবতে হবে সমাজে ভাবের রাজনৈতিক ক্রিয়া নিয়ে। আর এখানেই আমরা পৌঁছোই ভাবাদর্শের মার্কসীয় ধারণাতে।

> প্রত্যেকটা যুগে শাসক শ্রেণির ভাব-ধারণাই কর্তৃত্বশালী ভাব-ধারণা। অর্থাৎ, যে শ্রেণিটা সমাজে শাসনকারী বৈষয়িক শক্তি, সেটা একই সঙ্গে কর্তৃত্বকর বুদ্ধিবৃত্তিগত শক্তিও বটে। বৈষয়িক উৎপাদনের উপকরণে যে শ্রেণির আয়ত্তি থাকে, সেটাই একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে মানসিক উৎপাদনের উপায়-উপকরণ। মোটামুটি বলা যায়, এইভাবে মানসিক উৎপাদনের উপায়-উপকরণ যাদের নেই, তাদের ভাব-ধারণা ওই শ্রেণির নিয়ন্ত্রণাধীন। কর্তৃত্বশীল ভাব-ধারণা প্রাধান্যশালী বৈষয়িক সম্পর্কতন্ত্রের ভাবগত অভিব্যক্তির চেয়ে, ভাব-ধারণা হিসেবে উপলব্ধ প্রাধান্যশালী বৈষয়িক সম্পর্কতন্ত্রের চেয়ে, আর তার থেকে যে সব সম্পর্ক একটা শ্রেণিকে করে তোলে শাসক সেগুলোর চেয়ে বেশি কিছু নয়, কাজেই এই শ্রেণির প্রাধান্যের ভাব-ধারণা। (*ভাবাদর্শ* পৃ. ৫৮)

দর্শন যখন ভাবাদর্শ হয়ে যায়, তখন সে নর-নারীকে ঐতিহাসিক সংঘাতের গুরুত্ব হতে বিভ্রান্ত করে দিতে চায়। আর তা সে করে পারমার্থিকতাকে মুখ্য করার ওপর জোর দিয়ে বা এই সংঘাতগুলোকে কোনো উচ্চতর বা কাল্পনিক পর্যায়ে সমাধানের প্রস্তাব দিয়ে। এই কারণেই মার্কস হেগেলীয়দের তিরস্কার করেছেন। এর বিপরীতে ইতিহাস হলো:

> নির্ভর করে কয়েকটা ব্যাপারে আমাদের সামর্থ্যের ওপর। সেগুলো হলো: জীবনের আপনারই ভৌত উৎপাদন থেকে শুরু করে আসল উৎপাদন প্রক্রিয়াটাকে বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা: সমগ্র ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এই প্রক্রিয়া দিয়ে সৃষ্ট সংসর্গ রূপটাকে (অর্থাৎ, বিভিন্ন পর্বে নাগরিক সমাজ) উপলব্ধি করা; রাষ্ট্র হিসেবে এটার কর্মের মাঝে এটাকে দেখান, চেতনার সমস্ত বিভিন্ন তত্ত্বগত উৎপাদ আর আকারগুলির ধর্ম, দর্শন, নীতিবিদ্যা ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা এবং সেই ভিত্তি থেকে সেগুলোর উৎপত্তি আর ক্রমবৃদ্ধি নির্ধারণ করা, সেই উপায়ে অবশ্য গোটা ব্যাপারটার বর্ণনা করা যায় সেটার সাকল্যের মাঝে (কাজেই এইসব বিভিন্ন দিকের পারস্পরিক ক্রিয়াটাকেও)। (*ভাবাদর্শ* পৃ. ৫০)

ভাববাদী চিন্তার বিপরীতে এই রকম বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিরন্তর ইতিহাসের বাস্তব জমিনের সাথে সংযুক্ত থাকে:

> এটা ভাব থেকে চলিত কর্মের ব্যাখ্যা করে না, বিভিন্ন ভাব গড়ে ওঠার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বৈষয়িক চলিত কর্ম থেকে; তদনুসারে এটা এই সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, মানসিক

> সমালোচনা দিয়ে, আত্মচেতনায় পরিণত করে কিংবা বিভিন্ন অপচ্ছায়া, অশরীরী মূর্তি, কল্পনা ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করে চেতনার সমস্ত রূপ আর উৎপাদগুলোকে মিলিয়ে দেয়া যায় না। সেটা করা যায় শুধু যেসব প্রকৃত সামাজিক সম্পর্ক এই ভাববাদী দমবাজি পয়দা করেছে সেগুলোকে কার্যক্ষেত্রে উচ্ছেদ করে (*ভাবাদর্শ* পৃ. ৫০)

মার্কসের কথাটা হলো, যদি প্রধান তাত্ত্বিক সমস্যাগুলোর আশ্রয়স্থল হয় সামাজিক স্ববিরোধ, তাহলে তা দার্শনিক নয়, কেবল রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা যেতে পারে। অন্য রকমের দার্শনিকতা এভাবে খোদ দর্শনকেই এক রকমে কেন্দ্র হতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অন্য অনেক প্রতি-দার্শনিকের মতো, যে জমিনে ডিসকোর্সটা ঘাঁটি গেড়েছে, মার্কস সেই পুরো জমিনটাকেই স্থানান্তরিত করতে চাইছেন। আর তা তিনি করতে চাইছেন দার্শনিক ধাঁধাগুলোকে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধি হবে উভয়ভাবে—বাস্তব ঐতিহাসিক সাবটেক্সটের উপসর্গ হিসেবে এবং সেই সাবটেক্সটকে দৃষ্টি সামনে থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়ার একটা পথ হিসেবে। দর্শন নিজেকে নিজ হতে জন্ম নেয়া হিসেবে যতই স্বপ্ন দেখতে চায়, তাকে মুখোমুখি হতে হয় সেই ব্যাপারের ওপর তার নির্ভরশীলতার ওপর, যা তাকে ছাপিয়ে গেছে। বস্তুবাদী পথ—

> দেখিয়ে দেয় যে, জীবাত্মার জীবাত্মা হিসেবে আত্মচেতনায় পরিণত হয়ে ইতিহাসের অবসান ঘটে না, এতে প্রত্যেকটা পর্বে পাওয়া যায় বৈষয়িক ফল:

> উৎপাদন-শক্তিসমূহের সমষ্টি, প্রকৃতির সঙ্গে এবং পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তি-মনুষ্যগণের ইতিহাসক্রমে গড়ে ওঠা সম্পর্ক, যা প্রত্যেকটা পুরুষ-পর্যায় পায় পূর্বপুরুষের কাছ থেকে; উৎপাদন-শক্তিসমূহ, পুঁজিতহবিল এবং পরিবেশের পুঞ্জ, যাতে একদিকে বাস্তবিকই অদলবদল ঘটায় নতুন পুরুষ-পর্যায়, কিন্তু অন্যদিকে আবার এর জীবনের পরিবেশ নির্দিষ্ট করে এবং এতে প্রদান করে একটা নির্দিষ্ট বিকাশ, বিশেষ চরিত্র। এটা দেখিয়ে দেয় যে, পরিস্থিতি মানুষকে গড়ে ঠিক যে পরিমাণে মানুষ গড়ে পরিস্থিতিকে। (*ভাবাদর্শ* পৃ. ৫১)

মানবতা তাহলে নিছক এর বস্তুগত শর্তের নির্ধারিত উৎপন্ন নয়। যদি তা-ই হতো, তাহলে কী করে মার্কস আশা করতেন যে মানবতা একদিন এই শর্তগুলোকে রূপান্তরিত করে দেবে? তিনি টমাস হবসের মতো চৈতন্যকে পরিস্থিতির নিছক প্রতিফলন হিসেবে দেখা *যান্ত্রিক* বস্তুবাদী নন। মার্কস একজন ঐতিহাসিক বস্তুবাদী এই অর্থে যে, ভাবের উৎস, চরিত্র ও ক্রিয়া তিনি ব্যাখ্যা করতে চান ভাব যে ঐতিহাসিক অবস্থার অন্তর্গত তার সাপেক্ষে। তা সত্ত্বেও তিনি হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে, সমস্ত দর্শন অপরিহার্যভাবে ভাববাদী নয়। তাঁর নিজের চিন্তা এমন নয়, যেমন নয় মার্কস যাদের কাছে শিখেছিলেন, ফরাসি এনলাইটেনমেন্টের সেই সব মহান বুর্জোয়া বস্তুবাদীদের চিন্তা। এই কারণেই সব ভাবাদর্শও *ভাববাদী* নয়। তা সত্ত্বেও, ভাববাদী দর্শন সম্পর্কে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি মৌলিক। তিনি ভাববাদী দর্শনকে দেখেছেন এক ধরনের ফ্যান্টাসি হিসেবে। এই ফ্যান্টাসি মনের মধ্যে সে জিনিস

অর্জন করার সংগ্রাম করে যা এখনও ঐতিহাসিক বাস্তবতায় পাওয়া যাচ্ছে না। আর এই অর্থে, ঐতিহাসিক অসঙ্গতির সমাধান দার্শনিক জল্পনার মৃত্যু-মন্ত্র উচ্চারণ করবে। কিন্তু এই কথা তো মার্কসের নিজের চিন্তার ক্ষেত্রেও সত্য। সত্যিকারের কমিউনিস্ট সমাজে মার্কসীয় দর্শনের কোনো স্থান থাকবে না। কারণ মার্কসীয় দর্শনের মতো দর্শন টিকে আছে কেবল তেমন এক সমাজ আনার কাজে সহায়তার জন্য। আদতেই, ইউটোপিয়াবিরোধী জায়গা থেকে, ভবিষ্যতের হাল-চাল আসলে কেমন দেখাবে সে বিষয়ে মার্কসের কাজ বিস্ময়কর রকম কম কথা বলে। সমস্ত র‍্যাডিকেল রাজনৈতিক তত্ত্বের মত, তাঁর চিন্তা শেষ পর্যন্ত নিজেকে নিজেই বিলীন করে দেবে। আর হয়তো এটাই সবচেয়ে গভীর সেই অর্থ, যে অর্থে তা ঐতিহাসিক।

নৃবিজ্ঞান

(উত্তর) আধুনিক চিন্তার মাঝে একটা প্রতি-বনিয়াদবাদী (anti-foundationalist) ঝোঁক আছে। এখানে মনে করা হয় যে, আমাদের অস্তিত্বের কোনো বিষয়গত জমিন আছে—এই রকম ধারণা আমাদেরই তৈরি করা এক রকমের খামখেয়ালি বানানো গল্প। এর বিপরীতে মার্কস অনেক ধ্রুপদী বা প্রথাগত দার্শনিক। তিনি মনে করেন, আমাদের সত্তার ভিত্তি হলো বস্তুগত প্রকৃতির সেই ভাগাভাগি করা রূপ যাকে তিনি নাম দিয়েছেন *প্রজাতি-সত্তা*। *মানব স্বভাব* নামের অভিব্যক্তিটির মতোই এই ধারণাটা বর্ণনা ও প্রাক-বর্ণনা, আসল অবস্থা ও মূল্যবোধের মাঝে রহস্যময় ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলে থাকে, আমরা কেমন আর আমাদের কেমন হওয়া উচিত সেই বিবরণ হয়ে। আমরা আমাদের টিকে থাকার জন্যই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল সহজাত সামাজিক প্রাণী। তথাপি এই ধারণা নৃতাত্ত্বিক সত্যের সঙ্গে সঙ্গে একটা রাজনৈতিক মূল্যবোধ হয়ে উঠতেই হয়। একজন ইতিহাস চিন্তাবিদ হিসেবে মার্কস চান মানব প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিবিদ্যক চিন্তার আরোপিত ভুল অমরত্বের হাত হতে উদ্ধার করতে। ঐতিহাসিকভাবে যা সৃষ্টি

হয়েছে তা ঐতিহাসিকভাবে বদলানোও যায়। তবে একটু এরিস্টটলীয় আবশ্যিকতাবাদীর মতো হয়ে কিছুটা কূটাভাষের মতো তিনি মনে করেন যে, মানব স্বভাব বা সারমর্ম বলে কিছু আছে, আর ন্যায্য সমাজ হবে সেটাই যেখানে এই স্বভাব নিজের মাঝে ফিরে আসতে বাধা পাবে না। তাহলে কী করে তিনি তাঁর চিন্তার এই গরমিল সমাধান করেন?

পূর্বসূরি হেগেলের মতো তিনি তা করেন পরিবর্তন, বিকাশকে মানবতার সারমর্ম হিসেবে দেখে। আমাদের স্বভাব হচ্ছে আমাদের ক্ষমতাকে আত্মস্থ করা। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে—কোন ধরনের ক্ষমতা আর কোন পরিস্থিতিতে আমরা তা আত্মস্থ করি। এটা একটা ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট ব্যাপার। *১৮৪৪-এর অর্থনীতি ও দর্শনের খসড়ার* তরুণ মার্কসের কাছে, আমরা আমাদের সঙ্গী মানবের সঙ্গে যতদূর বিশেষ রকমের প্রজাতি-সত্তা ভাগাভাগি করি ততদূর পর্যন্তই আমরা মানব:

> প্রকৃতির মানব-প্রেক্ষিত কেবল সামাজিক মানুষের জন্যই অস্তিত্ববান। কারণ মানুষ যখন সামাজিক হয় কেবল তখনই প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে বন্ধন হিসেবে বহাল হয়। কেবল তখনই মানুষের নিজ অস্তিত্ব অন্যের জন্য এবং অন্য মানুষের অস্তিত্ব তার জন্য বহাল হয়। প্রকৃতি কেবল তখনই মানব বাস্তবতার জীবন-উপাদান হিসেবে, মানব অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে। কেবল এখানেই যা তার কাছে স্বাভাবিক অস্তিত্ব তা হয় মানব-অস্তিত্ব, আর প্রকৃতি তার কাছে মানুষ হয়ে যায়। এইভাবে, সমাজ হলো প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পূর্ণ ঐক্য, প্রকৃতির সত্যিকারের

> পুনরুত্থান, মানুষের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতিবাদ এবং প্রকৃতির সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মানবতাবাদ ।...সর্বোপরি, স্বতন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে নিরাকরণ হিসেবে আবার সমাজের স্বতঃসিদ্ধায়িতকরণ থেকে এড়িয়ে যেতে হবে। স্বতন্ত্র হলো সামাজিক সত্তা। তাদের জীবন-প্রকাশ (এমনকি তা অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে সম্প্রদায়ের মধ্যে সরাসরিভাবে মনে না হলেও) তাই সামাজিক জীবনের এক প্রকাশ এবং অনুমোদন। মানুষের স্বতন্ত্র আর প্রজাতি-জীবন আলাদা নয়। (১৮৪৪)

এই প্রজাতি-সত্তার কী কোনো লক্ষ্য বা পরিণতি আছে? এক অর্থে হ্যাঁ, অন্য অর্থে না। এক রকমের সৃজনশীল পুনরাবৃত্তি হিসেবে আমাদের প্রজাতি-সত্তার পরিণতি নিহিত নিজেকে বাস্তবায়িত করার মাঝেই। অন্যান্য রোমান্টিক র‍্যাডিকেলদের মতো মার্কসও মনে করেন আত্ম-উল্লসিত বিকাশ ছাড়া মানব অস্তিত্বের আর চূড়ান্ত কোনো বিন্দু নেই, থাকা উচিত নয়:

> যখন মেহনতি কমিউনিস্টরা একত্রিত হয়, তখন তত্ত্ব, প্রচার, ইত্যাদি তাদের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হলেও, একই কালে তারা একটা নতুন প্রয়োজন আয়ত্ত করে। এই প্রয়োজন হলো সমাজের প্রয়োজন। আর যা উপায় বলে মনে হচ্ছিল তা-ই হয়ে যায় লক্ষ্য। এই ব্যবহারিক বিকাশটা সবচেয়ে আকর্ষণীয়ভাবে লক্ষ্য করা যায় ফরাসি সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের জমায়েতে। ধূমপান, খাদ্যগ্রহণ, পান করা ইত্যাদি আর লোকজনের মাঝে যোগসূত্র গড়ে তোলার মাধ্যম নয়। সঙ্গ, সংঘ, আলাপচারিতাই (যার আবার লক্ষ্য

হলো সমাজ) তাদের জন্য যথেষ্ট। মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ফাঁকা বুলি নয়, এটা একটা বাস্তবতা। তাদের কর্ম-জীর্ণ শরীর হতে আমাদের ওপর বিকিরিত হয় মানুষের মহত্ত্ব। (১৮৪৪)

নিজের আত্ম-বিকাশই নিজের চূড়ান্ত লক্ষ্য, এমন কোনো স্বভাবের রোমান্টিক ধারণা মার্কসের কালের অপর দুটো শক্তিশালী চিন্তার বিরোধী ছিল। প্রথমটা হলো সেই ধরনের অধিবিদ্যক বিচার, যা মানুষের কাজ-কর্মকে কোনো এক উচ্চতর বিচারসভার সামনে হাজির হওয়ার সমন পাঠাত। সেই বিচারসভার অনেক নাম: কর্তব্য, নৈতিকতা, ধর্মীয় বিধি, পরম ভাব, এই সব। নিজের মতো নীতিবাদী মার্কস এ রকম অধিবিদ্যার গভীর বিরোধী ছিলেন। তাঁর কাছে নৈতিকতা আসলে আমাদের সৃজনশীল ক্ষমতা ও সামর্থ্যের উন্মোচনের প্রক্রিয়ার মাঝে নিহিত, মানুষের ওপরে ঝুলিয়ে রাখা বা পেছন হতে তৈরি করে দেওয়া কোন মহান বিধির মাঝে তাকে খোঁজা অর্থহীন। একটু হাসি বা কোনো গানের যতটা ন্যায্যতা দরকার, এই প্রক্রিয়ার তার চাইতে বেশি ন্যায্যতার প্রয়োজন নেই। এটা আমাদের সাধারণ স্বভাবের মাঝেই নিহিত।

কিন্তু এই নৈতিক সত্য দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয় সেই সহায়ক বুদ্ধির সঙ্গে যার কাছে ব্যক্তি অস্তিত্বমান থাকে কোনো বৃহত্তর লক্ষ্যের খাতিরে: যেমন রাজনৈতিক রাষ্ট্র অথবা মার্কসের কালের প্রভাবশালী হিতবাদী চিন্তার মতে—সার্বিক সুখের প্রসারের জন্য। এই পথ/পরিণতির যুক্তিবিচারকে মার্কস মনে করতেন, শ্রেণি-সমাজ প্রভাবিত যুক্তি যেখানে সংখ্যাগুরুর শক্তি মুষ্টিমেয়র মুনাফা করার

সহায়ক মাত্র। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজেঃ

> শ্রম, জীবন ক্রিয়া, খোদ উৎপাদনশীল জীবনকেই মানুষের কাছে মনে হয় কেবলমাত্র অভাব পূরণের নিছক এক উপায় মাত্রা। এই অভাব শারীরিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার। কিন্তু উৎপাদনশীল জীবন তো প্রজাতি-জীবন। এটা তো জীবন-উৎপাদনকারী জীবন। প্রজাতির সমস্ত স্বভাব, এর প্রজাতি-স্বভাব বাস করে এর জীবন ক্রিয়ার প্রকৃতির মাঝে। আর মুক্ত সচেতন ক্রিয়া মানুষের প্রজাতি-স্বভাব গঠন করে। (পুঁজিবাদে), জীবনকে নিছক জীবিকা বলে মনে হয়। (১৮৪৪)

শ্রেণি সমাজে ব্যক্তি বাধ্য হয় তার আত্ম-বাস্তবায়নকারী প্রজাতি-সত্তাকে নিছক বস্তুগতভাবে টিকে থাকার হাতিয়ারে রূপান্তরিত করতে। তবে অবশ্যই এই ধরনের সহায়ক বুদ্ধিকে যে মার্কস একেবারে খারিজ করে দেন এমন নয়। এটা ছাড়া যৌক্তিক কোন ক্রিয়াই থাকবে না। আর মার্কসের নিজের বিপ্লবী রাজনীতিতে পথের সঙ্গে পরিণতির খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারটা অকাট্যরূপে যুক্ত আছে। তবে তাঁর চিন্তার অনেক পরিহাসের মাঝে একটা হলো—এই চিন্তা এমন একটা সমাজ নির্মাণের কাজে লাগে যেখানে নারী ও পুরুষ বিকশিত হতে পারবে নিজেই নিজেদের র‍্যাডিকেল লক্ষ্য হিসেবে। মার্কসের কাছে ব্যক্তিমানুষ গভীর মূল্য ধারণ করে। এই কারণেই তিনি সেই সমাজব্যবস্থা খারিজ করে দেন যেখানে তত্ত্বে ব্যক্তিবাদের মূল্যের ঢোল বাজিয়ে, কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে নামহীন কিছু খুচরো পয়সার অবস্থায় নামিয়ে

আনা হয়।

যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়—বলো তো, মার্কসের নীতিবিদ্যার বৈশিষ্ট্য কী? তাহলে উত্তরে কেউ হয়তো একে *নান্দনিক* বলবেন, এর চাইতেও মন্দ উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ নান্দনিকতা হচ্ছে ঐতিহ্যগতভাবে মানব অনুশীলনের সেই ধরন যার সে কী কাজে লাগবে সেটা বুঝিয়ে দেয়ার কোনো বালাই নেই, যে নিজেই নিজের লক্ষ্য, ভিত্তি ও যুক্তি যোগান দেয়। এটা নিছক পূর্ণতার আনন্দে নিজেকেই নিজে পূর্ণ করার তেজের কসরত। আর মার্কসের কাছে সমাজতন্ত্র এমন একটা হাতে-কলমের আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের জন্য এই সুযোগটার ব্যবস্থা করা। যেখানে ছিল নান্দনিক শিল্প, সেখানে থাকবে মানবতা। এ কারণেই তিনি এমন সমাজ চান যেখানে শ্রম হবে যদ্দুর সম্ভব স্বয়ংক্রিয়, যাতে নারী ও পুরুষ (পুঁজিপতি ও সেই সাথে শ্রমিক) আর নিছক উৎপাদনের হাতিয়ারে পর্যবসিত হবে না, এবং গৎবাঁধা পথে না গিয়ে মুক্তভাবে নিজ ব্যক্তিত্ব বিকশিত করতে পারবে। তাঁর কাছে সমাজতন্ত্র অত্যন্ত মারাত্মকভাবে নির্ভর করে কর্ম-দিন কমানোর ওপর যাতে সবাই বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়ঃ

> এই ক্ষেত্রে (শ্রমের) মুক্তি রূপ ধারণ করতে পারে কেবল সমাজীকৃত মানুষের দ্বারা, সংঘবদ্ধ উৎপাদনকারীদের দ্বারা, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের লেনা-দেনাকে যুক্তিসিদ্ধভাবে পরিচালন এবং প্রকৃতি কর্তৃক, তথা তার অন্ধ শক্তিসমূহ কর্তৃক শাসিত না হয়ে, তাকে তাদের সামূহিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা এবং ন্যূনতম কর্মশক্তি ব্যয়ে এবং তাদের

> মানব-প্রকৃতির পক্ষে সর্বাধিক অনুকূল ও উপযুক্ত অবস্থাধীনে এই লক্ষ্য সাধন করার মাধ্যমে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা তখনো থেকে যায় প্রয়োজন পূরণের পরিধির মধ্যে। এই পরিধি ছাড়িয়েই শুরু হয় মানবিক শক্তির সেই বিকাশ, যা নিজেই নিজের উদ্দেশ্য, শুরু হয় স্বাধীনতার সত্যিকারের জগৎ। কিন্তু তা কুসুমিত হতে পারে কেবল প্রয়োজন-পূরণের জগতের ভিত্তির ওপরেই। কাজের দিনের দীর্ঘতা হ্রাস হচ্ছে তার মৌল পূর্বশর্ত। (অধ্যায় ৪৮, *পুঁজি* ৩, পৃ.৩৫৫ কলকাতা, খণ্ড ৬)

অন্যভাবে কথাটা এভাবে বলা যায় যে, মার্কস মানুষের *ব্যবহার-মূল্যকে বিনিময়-মূল্যের দাসত্ব* হতে মুক্ত করতে চান। কোনো সামগ্রী তাঁর কাছে একটা সংবেদনের জিনিস, যা ব্যবহার ও উপভোগের সময় এর নির্দিষ্ট গুণের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা উচিত। *ব্যবহার-মূল্য* বলতে মার্কস এই কথাটাই বুঝতেন। তবে, পুঁজিতান্ত্রিক অবস্থার অধীনে সব জিনিস পণ্যের স্তরে নামিয়ে আনা হয়, বিনিময়-মূল্য না থাকলে, কেনা-বেচা না হলে এদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। একই মূল্যের যে কোনো দুটো পণ্য একে অপরের সাথে একটা বিমূর্ত সমতায় পর্যবসিত হয়। এভাবে তাদের নির্দিষ্ট সংবেদনগত বৈশিষ্ট্য ক্ষতিকরভাবে উপেক্ষিত হয়, কারণ এদের ভিন্নতা তখন অভিন্নতার চাপে পড়ে এক হয়ে যায়।

কিন্তু একই সমাজ ব্যবস্থার অধীনে মানুষের বেলাতেও তো এই কথা সমান সত্য। বাজারের অবস্থা অনুযায়ী, এক ব্যক্তি এখানে অপর ব্যক্তির মুখোমুখি হয় বিমূর্ত, বিনিময়যোগ্য সত্তা

হিসেবে। মানুষ এখানে হয়ে যায় পণ্য, সবচেয়ে বেশি দর যে দেয় তার কাছে সে নিজের শ্রম ক্ষমতা বিক্রি করে। আর সে কী উৎপাদন করছে, পুঁজিপতিও তা নিয়ে মাথা ঘামায় না যতক্ষণ সে ওই উৎপাদন দিয়ে মুনাফা করতে পারছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যা ঘটে, তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সত্য: বুর্জোয়া রাষ্ট্র ভোটের বেলায় তার নাগরিকদের বিমূর্তভাবে সমান বিবেচনা করে। আর তা সে কেবল এমন একভাবে যা নাগরিকদের নির্দিষ্ট সামাজিক অসমতা দাবিয়ে রাখে, লুকিয়ে রাখে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের লক্ষ্য হলো রাজনৈতিক রূপ ও সামাজিক উপাদানের মাঝের এই ফাটল বুঁজিয়ে দেয়া, যাতে রাজনৈতিক রাষ্ট্রের মাঝে অংশগ্রহণকারী নাগরিক হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব যথার্থ ব্যক্তি হিসেবে আমাদের উপস্থিতি হয়ে ওঠে:

> কেবল যখন বাস্তব, ব্যক্তি মানুষ নিজের মাঝে বিমূর্ত নাগরিককে জারি রাখবে এবং একজন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তার পরখি জীবন, তার ব্যক্তি কাজ ও ব্যক্তি সম্পর্ক প্রজাতি-সত্তা হয়ে উঠবে, কেবলমাত্র যখন মানুষ তার নিজ ক্ষমতা সামাজিক শক্তি হিসেবে সংগঠিত করবে, চিনে নেবে যাতে সামাজিক শক্তি রাজনৈতিক শক্তির রূপ ধরে তার সাথে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে না, কেবল তখনই মানব মুক্তি সম্পূর্ণ হবে। (১৮৪৪)

মার্কস ঠিক যেভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পণ্য বিনিময় উচ্ছেদ করে উৎপাদনকে মুনাফার বদলে ব্যবহারের জন্য বদলে নিতে চান, সেভাবেই তাঁর ইচ্ছে মানব ব্যক্তিত্বকে *বি-পণ্যায়ন* করা। তাহলে

বিমূর্ত, উপযোগবাদী লজিকের কয়েদ থেকে ব্যক্তির সংবেদনগত বিকাশের সম্পদ মুক্ত হতে পারে। পুঁজিবাদের অধীনে আমাদের সংবেদনই পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ফলে কেবল ব্যক্তি সম্পত্তি বিলোপের মাধ্যমেই মানব শরীর মুক্ত হতে পারে আর মানব সংবেদন মানুষের নিজের হতে পারেঃ

> ব্যক্তিগত সম্পত্তির অতিক্রমণ হলো সমস্ত মানবিক সংবেদন এবং গুণাবলির পরিপূর্ণ মুক্তি। পরিপূর্ণ মুক্তি কেন? সংক্ষেপে তা হলো এই জন্য যে, তখন এসব সংবেদন এবং গুণাবলি বিষয়ীগত এবং বিষয়গতভাবে মানবিক হয়ে যায়। চোখ হয়ে যায় মানবিক চোখ, ঠিক যেমন এর বিষয় হয়ে যায় সামাজিক, মানবিক বিষয়। মানুষের দ্বারা মানুষের জন্য তৈরি করা বিষয়। তাই সংবেদনগুলো সরাসরি তাদের প্রয়োগে তাত্ত্বিক হয়ে যায়। তারা কোনো জিনিসের সঙ্গে যুক্ত হয় ওই জিনিসের খাতিরেই, কিন্তু জিনিসটা নিজে নিজের এবং মানুষের জন্য এক বিষয়গত মানব সম্পর্ক এবং এর বিপরীতটাও। ফলস্বরূপ, প্রয়োজন বা উপভোগ হারায় তার হামবড়া স্বভাব, আর প্রকৃতি মানবীয় হয়ে যায় বলে আর নিছক ব্যবহারের উপযোগিতার ব্যাপার থাকে না। (১৮৪৪)

মার্কসের রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান শ্রমের অনেক বিস্তৃত ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একে বলা যায়—সমাজ জীবনের উৎস হিসেবে মানব শরীর- সংক্রান্ত ধারণা। সমাজ জীবন যত বেশি জটিল হয়ে ওঠে, বিভিন্ন উৎপাদকের মাঝে বিভিন্ন রকমের ধরনে বিভাজিত হয়ে অবধারিতভাবে শ্রমও তত বেশি বিশেষায়িত হয়ে ওঠে। মার্কস একেই বলেন শ্রম বিভাজন। উৎপাদন শক্তিকে বিকশিত ও

পরিশীলিত করার এ এক অবধারিত পথ। মার্কস কিন্তু এর মাঝে এক রকমের বিচ্ছিন্নতা দেখতে পান। এই বিচ্ছিন্নতায় মানব ক্ষমতা বাস্তবায়িত হয় পক্ষাঘাতের মতো এক-পেশেভাবে। এই বাস্তবায়ন তার চৌকষ অপরিমিত মেধার সম্পদে ধনী আদর্শ ব্যক্তির ধারণার বিরোধী। এভাবে শ্রম বিভাজন শ্রেণি সমাজে ব্যক্তি ও সমগ্রের মাঝে বিচ্ছেদের আরেক উদাহরণ। কারণ, কারখানার শ্রমিকের যান্ত্রিক শ্রমের মতো কোন একক কাজে আমাদের প্রজাতি-সত্ত্বার পূর্ণ সম্ভাবনা ক্ষয় পেতে থাকে:

> শেষে, মানুষ যতক্ষণ থাকে স্বাভাবিক সমাজে, অর্থাৎ বিশেষ আর সাধারণী স্বার্থের মধ্যে একটা ফাটল যতক্ষণ থাকে, কাজেই যতক্ষণ কর্মবৃত্তি বিভক্ত থাকে ঐচ্ছিকভাবে নয়, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে, ততক্ষণ মানুষের নিজ কৃতি কীভাবে হয়ে ওঠে তার বিরুদ্ধ একটা পরক শক্তি, যেটা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার বদলে তাকে দাসে পরিণত করে, তার প্রথম দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা পাই শ্রম বিভাগ। কেননা যেইমাত্র শ্রমের বণ্টন হয়ে যায়, অমনি প্রতিটি মানুষের থাকে কর্মবৃত্তির একটা বিশেষ ধরনের একক স্বতন্ত্র ক্ষেত্র, যেটা তার ওপর জোর করে চেপে বসে, যেটাকে সে এড়াতে পারে না। সে হতে পারে শিকারি, জেলে, মেষপালক কিংবা বৈচারিক সমালোচক, তাইই তার থেকে যেতে হবে, নইলে তার জীবিকা নির্বাহের উপায় খোয়া যাবে। কিন্তু কমিউনিস্ট সমাজে কারও কর্মবৃত্তির কোনো একটামাত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্র থাকবে না। সেখানে প্রত্যেকে ইচ্ছামতো যেকোনো শাখায় কুশলী হয়ে উঠতে পারবে। সমাজ সাধারণ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে, আমার পক্ষে আজ একটা এবং আগামীকাল অন্য

> একটা কিছু করা, সকালে শিকার করা, বিকেলে মাছ ধরা, সন্ধ্যায় পশুপালন করা, রাতের খাবারের পর কাব্য আলোচনা করা সম্ভব করে তোলে, ঠিক যেমনটা আমার মন চায়, তাতে আমার কখনো শিকারি, মেছুয়া, মেষপালক কিংবা সমালোচক হওয়া আবশ্যক নয়। (*ভাবাদর্শ* পৃ. ৪১)

খ্যাত বা কুখ্যাত বলি, এটা মার্কসের অল্প কয়েকটা ইউটোপীয় আন্দাজের একটা।

যেকোনো নৈতিকতার মতোই অনিবার্যভাবে মার্কসের রাজনৈতিক নৈতিকতা নিয়েও অনেক সমস্যা আছে। এটা কি মুক্তভাবে স্বনির্মিত মানব বিষয়ীর ধারণা, যে হয়তো বুর্জোয়া, পিতৃতান্ত্রিক মানুষের তেজি আত্ম-উৎপাদনকারী মডেলের চাইতে একটু বেশি উদারমনা সংস্করণ? মার্কসের আদর্শ মানুষ কি কোন ধরনের সর্বহারা প্রমিথিউস? কতদূর পর্যন্ত তা মধ্যবিত্ত সীমাহীনতার আদর্শের বামপন্থী সংস্করণ, সম্পদের ফাউস্টীয় বাস্তবায়ন, যে কিনা সত্তাকেও দখল করার জিনিস বলে বিবেচনা করে? কেউ হয়তো এই তত্ত্বে বরং অতি নিষ্করুণ সক্রিয়তা খুঁজে পাবেন, যে সক্রিয়তা ওয়ার্ডসওয়ার্থের *বিজ্ঞ নিশ্চেষ্টতা* (wise passiveness) বা কিটসের *নেতিবাচক সক্ষমতা* (negative capability) কে তুচ্ছ বলে গণ্য করে। আমাদের কি সমস্ত ক্ষমতা ও সামর্থ্য বাস্তবায়ন করতে হবে? যে সব সামর্থ্য মুমূর্ষু বা ধ্বংসাত্মক মনে হয় সেগুলোর ব্যাপারে কী হবে? মার্কস যদি মনে করেন যে কেবল অবদমিত হয়ে থাকলেই আমাদের ক্ষমতা ধ্বংসাত্মক হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই তিনি ভুল ভেবেছেন। আরেকটা কথা, আমরা

কীভাবে আমাদের বেশি ইতিবাচক বা নেতিবাচক সামর্থ্যগুলোর মাঝে পক্ষপাত করব, যদি আমাদের কাছে এই ঐতিহাসিকভাবে আপক্ষিক প্রক্রিয়া ছাপিয়ে আর কোনো নির্ণায়ক না থাকে? বহুপাক্ষিক বিকাশ ব্যাপারটা একক সৃজনশীল মেধার কর্ষণের তুলনায় কিছুটা নিচু মানের মনে হতে পারে। ঠিক একইভাবে আত্ম-অস্বীকারকে মনে হতে পারে আত্ম-প্রকাশের চেয়ে কিছুটা বেশি প্রশংসাযোগ্য। এসব পর্যালোচনার কয়েকটার পাল্টা জবাব দেয়া যায়। মার্কস একজন ভালো বস্তুবাদী ছিলেন, মানব আত্ম-বিকাশ সীমাহীন হতে পারে বলে তিনি সাদামাটাভাবে বিশ্বাস করেন নি। তিনি আমাদের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সীমাবদ্ধতার ব্যাপারেও সজাগ ছিলেন:

> মানুষ সরাসরি এবং স্বাভাবিক সত্তা। স্বাভাবিক সত্তা, এক জীবন্ত স্বাভাবিক সত্তা হিসেবে সে এক দিকে জীবনের স্বাভাবিক, প্রাণবন্ত ক্ষমতায় সজ্জিত। মানে সে এক সক্রিয় স্বাভাবিক সত্তা।...অপরদিকে, স্বাভাবিক, শরীরী, সংবেদনগত, বিষয়গত সত্তা হিসেবে সে পশু আর বৃক্ষের মতোই যাতনাভোগী, শর্তাবদ্ধ, ও সীমাবদ্ধ সত্তা। তার প্রণোদনার বিষয় তার থেকে স্বাধীন বিষয় হিসেবে তার বাইরে বিরাজ করে। কিন্তু এই বিষয়গুলো তার প্রয়োজনের, প্রামাণিক বিষয়। এই বিষয়গুলো তার প্রামাণিক ক্ষমতার চর্চা ও স্বীকৃতির জন্য অপরিহার্য। (১৮৪৪)

মার্কস হয়তো উৎপাদনকে বেশি দর দিয়েছেন, তবে নিশ্চিতভাবেই একে অর্থনৈতিক অর্থে সংকীর্ণ করে দেননি। বরং উলটো, তিনি

একে ভেবেছেন পুঁজিবাদের মরমিভাবে নিঃস্ব করা একটা বৈশিষ্ট্য হিসেবে। *উৎপাদন* তাঁর কাছে এক সমৃদ্ধ সুপরিসর ধারণা, যা *আত্ম-যাথার্থায়নের* সমতুল্য। আর সেই নিরিখে একটা আমের স্বাদ নেয়া বা ঠুমরি শোনা বড় দালান বানানোর মতোই আমাদের আত্ম-যাথার্থায়নেরই একটা দিক।

> ...যখন সীমিত বুর্জোয়া ধরন ছুঁড়ে ফেলা হয়, সম্পদ তখন সার্বিক বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যক্তি প্রয়োজনের, সক্ষমতার, আনন্দের, উৎপাদন শক্তির ইত্যাদির সার্বিকতা ছাড়া আর কী? প্রকৃতির শক্তির ওপর মানুষের আধিপত্যের পূর্ণ বিকাশ, তথাকথিত প্রকৃতি সেই সঙ্গে মানবতার নিজস্ব প্রকৃতির ওপর? তার সৃজনশীল সম্ভাবনার পরম মেলে ধরা, যেখানে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক বিকাশ একমাত্র পূর্বধারণা, যে এই বিকাশের সম্পূর্ণতা গড়ে তোলে, মানে, এই রকম সমস্ত মানব ক্ষমতার নিজেই নিজের লক্ষ্য হিসেবে বিকাশ, কোনো আগে থেকে ঠিক করা মাপকাঠিতে মেপে নয়। যেখানে সে নিজেকে কোনো এক বিশেষতায় নয়, বরং নিজের সমগ্রতা পুনরুৎপাদন করে, যা সে হয়ে গেছে তা হয়ে থাকার জন্য নয়, বরং হয়ে ওঠার পরম আন্দোলনে। (গ্রুন্ড্রিজে)

জগতকে রূপান্তরের মাধ্যমে নিজ ক্ষমতা উন্মোচন করার নিরিখে আমাদের প্রজাতি-সত্তা তাহলে সহজাতভাবেই উৎপাদনশীল:

> মানুষ তার প্রায়োগিক ক্রিয়াশীলতা দ্বারা বিষয়ের জগত সৃষ্টির কালে, অজৈব প্রকৃতির দিকে তার কাজে নিজেকে প্রমাণ করে চৈতন্যশীল প্রজাতি-সত্তা হিসেবে। তার মানে, এমন একটি সত্তা যা প্রজাতিসমূহকে নিজের প্রামাণিক

> সত্তারূপে বিবেচনা করে, কিংবা নিজেকে একটি প্রজাতি-সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে। এটা স্বীকৃত যে, অন্য প্রাণীরাও উৎপাদন করে। তারা নিজেদের বাসা, ইত্যাদি তৈরি করে। কিন্তু প্রাণীরা কেবল তা-ই উৎপন্ন করে যা তাদের নিজেদের ও শাবকদের প্রত্যক্ষ চাহিদাগুলো মেটানোর জন্য দরকার। তাদের এই উৎপাদন একপেশে, অপরদিকে মানুষের উৎপাদন সার্বিক। পশুর উৎপাদন শুধু প্রত্যক্ষ দৈহিক চাহিদার বশবর্তী ফল। অপরদিকে, মানুষের উৎপাদন শরীরবৃত্তিক চাহিদা না থাকলেও অব্যাহত থাকে। আদতে, শরীরবৃত্তিক চাহিদা হতে স্বাধীন উৎপাদনই হচ্ছে প্রকৃত উৎপাদন। (১৮৪৪)

শিল্পীর মতো যখন আমরা কোন কায়িক প্রয়োজনের তাড়না ছাড়াই উৎপাদন করতে পারি, তখনই আমরা স্বাধীন। আর এই স্বভাবই মার্কসের কাছে সকল ব্যক্তির সারমর্ম। একটা জগত কায়দা মতো তৈরি করার মাধ্যমে আমার নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিকতা গঠন করি। আর তা করতে গিয়ে আমি তাকেও বাস্তবায়িত করছি সবচেয়ে গভীরভাবে, যে অপরের সাথে আমার মিল আছে, যেখানে স্বতন্ত্র এবং প্রজাতি-সত্তা চূড়ান্ত বিচারে একই। আমার উৎপাদন অপরের কাছে আমার অস্তিত্ব আর তা আমার কাছে অপরের অস্তিত্ব পূর্বানুমান করে। মার্কসের মতে এটা একটা সত্তাতত্ত্বীয় সত্য। আমরা যে ধরনের প্রাণী এ তারই অনুবর্তী। তবে নির্দিষ্ট কোনো ধরনের সমাজ জীবনের পক্ষে সত্তার দুই মাত্রা, মানে ব্যক্তিক ও সম্প্রদায়ের মাঝে ঝামেলা লাগিয়ে বিভাজন আনা সম্ভব। আর একেই তরুণ মার্কস বলছেন বিচ্ছিন্নতা। এক অর্থে, এমন ফাটল

সব সময়ই ছিল। যেহেতু মানুষের সারমর্মের মাঝেই এই ব্যাপারটা আছে যে, সে নিজ স্বভাব *বিষয়করণ* করতে পারে, এর থেকে দূরে সরে থাকতে পারে, আর তা আছে আমাদের মুক্তির গোড়াতেই। কিন্তু শ্রেণি-সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী ও পুরুষের উৎপাদিত বিষয় আত্মসাৎ করে নেয় অল্প কয়েকজন যাদের হাতে উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিকানাও নিয়ন্ত্রণ। আর এর মানে হলো তারা যে জগত সৃষ্টি করেছে সেই জগতে তারা আর নিজেদের চিনতে পারছে না। তাদের আত্ম-বাস্তবায়ন আর নিজেই নিজের লক্ষ্য নেই, তা বরং হয়ে গেছে অপরের আত্ম-উন্নয়নের নিখাদ সহায়ক:

> এই তথ্যটি এটুকু প্রকাশ করে যে, শ্রম-উৎপাদিত বিষয়, শ্রমের উৎপন্ন বিজাতীয় কিছু একটা হিসেবে এর মুখোমুখি হয়, মুখোমুখি হয় উৎপাদনকারী হতে স্বাধীন একটা ক্ষমতা হিসেবে। শ্রমের উৎপন্ন হলো এমন শ্রম যা কোনো বিষয়ে রূপায়িত হয়েছে, এমন শ্রম যা বস্তুগত হয়েছে: এটা হলো শ্রমের বিষয়করণ। শ্রমের উপলব্ধি করা হলো এর বিষয়করণ। এই সব অর্থনৈতিক শর্তের অধীনে শ্রমের এই উপলব্ধিকরণ শ্রমিকের জন্য উপলব্ধিহীনতা হিসেবে প্রতীয়মান হয়; বিষয়করণ প্রতীয়মান হয় বিষয়হীনতা এবং বিষয়ের বন্ধন হিসেবে; অধিকার করা প্রতীয়মান হয় বিচ্ছিন্নতা হিসেবে, বিজাতীয়তা হিসেবে। বিচ্ছিন্ন শ্রম শুধু ১) মানুষ হতে প্রকৃতিকে এবং ২) মানুষকে নিজ হতে, সক্রিয় কাজ হতেই বিচ্ছিন্ন করে তা নয়, এর কারণে মানুষ তার প্রজাতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটি তার প্রজাতি-জীবনকে তার একক জীবনের উপায় বানিয়ে ফেলে। (১৮৪৪)

মার্কসের মন্তব্য অনুযায়ী, শ্রমিক কেবল তখনই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে যখন সে কাজ করে না, আর যখন সে কাজ করে তখন সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। বিচ্ছিন্নতা একটা বহুমুখী প্রক্রিয়া। এটা শ্রমিকের সঙ্গে স্বভাবের, তার উৎপন্নের এবং খোদ শ্রম প্রক্রিয়ার, তার নিজ শরীরের বিচ্ছেদ ঘটায়, সেই সাথে আরো বিচ্ছেদ ঘটায় সেই সম্প্রদায়গত জীবন-ক্রিয়ার যা তাকে সত্যিকারের মানব সত্তা হিসেবে গড়ে তুলে। মার্কস লিখছেন, *সাধারণভাবে, মানুষ তার প্রজাতি-সত্তা হতে বিচ্ছিন্ন, এই বিবৃতির মানে হলো মানুষ অপর হতে বিচ্ছিন্ন এবং মানুষের সারমর্ম হতে সবকিছু বিচ্ছিন্ন*। (১৮৪৪)

যে শাসন এই অবস্থা সৃষ্টি করল, বাস্তব হারানোর যাতনায় উৎপাদক নিজ শ্রম দিয়ে পরিহাসমূলকভাবে তাকেই শক্তিশালী করে:

> শ্রমিক নিজেকে যত খরচ করে ফেলে, বিষয়ের বিজাতীয় জগত ততই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই বিজাতীয় জগত শ্রমিক নিজের ওপর নিজেরই বিরুদ্ধে সৃষ্টি করেছে। শ্রমিক যত দরিদ্র হয় তার ভেতরকার জগতটার নিজের মতো করে অধিকার সে ততই হারাতে থাকে। ধর্মের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। মানুষ ঈশ্বরের ওপর যত বেশি আরোপ করে, তার নিজের মাঝে থাকা জিনিসের ওপর তার নিজের অধিকার তত কমে। শ্রমিক বিষয়ের ওপর নিজের জীবনটা দিয়ে দেয়। তারপর তার নিজের জীবন আর নিজের থাকে না, হয়ে যায় বিষয়ের জীবন। এমনি করে, এই ক্রিয়া-কাণ্ড যত বড় হয়, শ্রমিক তত বিষয়হারা হয়ে ওঠে। তার শ্রমের উৎপন্ন আর যা-ই হোক, সে নিজে তো নয়। অতএব, যত বড় উৎপন্ন, শ্রমিক নিজে তত ক্ষুদ্র। নিজ উৎপন্নের মধ্যে

> শ্রমিকের বিজাতীয়তা শুধু এই বোঝায় না যে, তার শ্রম একটি বিষয়, একটি বাহ্যিক অস্তিত্ব হয়ে যায়, বরং এ-ও বোঝায় যে, এটা শ্রমিকের বাইরে, তার প্রতি বিজাতীয় কিছু একটা হিসেবে স্বাধীনভাবে অস্তিত্বমান থাকে। আরো বোঝা যায় যে, এই বিজাতীয় শ্রম নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে শ্রমিকের মুখোমুখি হয়। এর মানে তাহলে এই যে, যে বিষয়কে শ্রমিক জীবন দান করলো, সেই বিষয়ই বিজাতীয় বেশে শত্রু হয়ে শ্রমিকের মুখোমুখি দাঁড়ালো। (১৮৪৪)

শ্রমিকের উৎপন্ন তার নিয়ন্ত্রণ হতে ফসকে গিয়ে নিজে সেয়ানা বনে স্বাধীন হয়ে যায় আর এই আধা-জাদুকরি ক্ষমতা তার ওপরই জাহির করে। মার্কস পরে এর নাম দিয়েছেন *পণ্যের বস্তুকাম* (Fetichism)। মার্কসের মতে, পণ্য হলো একটা উৎপাদিত বস্তু যা অপর একটার সাথে সমানভাবে বিনিময় করা যায় কারণ তা সমান পরিমাণ শ্রম অঙ্গীভূত করে। *ক্যাপিটালে* তিনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন:

> ধরা যাক, দুটি পণ্য, যেমন, শস্য এবং লোহা। এই পণ্য দুটি যে অনুপাতে বিনিময়যোগ্য, তা সে যে অনুপাতেই হোক না কেন, তাকে এমন একটি সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় যাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের সমান হয় কিছু পরিমাণ লোহা... এই সমীকরণ থেকে আমরা কী পাচ্ছি? এ থেকে আমরা পাচ্ছি এই যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য—১ কোয়ার্টার শস্য এবং x হন্দর লোহা, এদের ভেতরে সমান সমান পরিমাণে এমন কিছু আছে যা উভয়ের ভিতরই বর্তমান। সুতরাং দ্রব্য দুটি একটি তৃতীয় দ্রব্যের সমান হতে বাধ্য, আর এই তৃতীয় দ্রব্যটি ঐ দুই দ্রব্যের কোনটিই নয়। কাজেই বিনিময়-মূল্য হিসেবে ওই দুটি দ্রব্যকে এই তৃতীয় দ্রব্যে

> পরিণত করা যাবেই ।...এই সর্বপণ্যে অবস্থিত সাধারণ গুণ পণ্যের জ্যামিতিক, রাসায়নিক অথবা অপর কোনো নৈসর্গিক গুণ হতে পারে না । এই ধরনের গুণগুলো ততটাই মনোযোগ আকর্ষণ করে যতটা এগুলো নানা পণ্যের উপযোগিতাকে প্রভাবিত করে, যতটা তা পণ্যকে ব্যবহার-মূল্যে পরিণত করে । কিন্তু বিভিন্ন পণ্যের বিনিময়-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের ব্যবহার-মূল্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা ।...ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পণ্যসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথমেই রয়েছে গুণগত পার্থক্য, কিন্তু বিনিময়-মূল্য হিসেবে আছে শুধু ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ, আর কাজে কাজেই বিনিময়-মূল্যের মধ্যে ব্যবহার-মূল্যের অণু মাত্রও নেই । তাহলে আমরা যদি পণ্যসমূহের ব্যবহার-মূল্যটা না ধরি তো তাদের একটিই সাধারণ বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে—তা হলো এই যে সেগুলো সবই শ্রম থেকে উৎপন্ন । (*ক্যাপিটাল* ১, পৃ. ৫৯-৬১, মস্কো)

এইভাবে মার্কসের কাছে পণ্যের অস্তিত্ব দুমুখো, সে দুটো জীবন যাপন করে । কারণ যা তাকে আসলে পণ্য বানায় তা অদ্ভুতভাবে তাদের বস্তুগত উপাদান হতে আলাদা । তারা আছে শুধু বিনিময় হওয়ার জন্য; আর একটা পণ্য সমস্ত সংবেদনগত চেহারা সত্ত্বেও, আরেকটা যে পণ্য সমান রকম শ্রম শক্তি অঙ্গীভূত করে তার সমান । কিন্তু একটা পণ্য তো তাহলে পুরোপুরি বিমূর্ত ব্যাপার, যে অন্য পণ্যের সঙ্গে এমন উপায়ে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে যেখানে সে উৎপাদকের বাস্তব জীবনের কোনো ধারই ধারে না:

> সুতরাং, পণ্য একটি রহস্যময় বস্তু, শুধু এই কারণেই নয় যে এর মধ্যে মানুষের শ্রমের সামাজিক চরিত্রটি তাদের কাছে

> সেই শ্রমোৎপন্ন জিনিসের ওপর ছাপ-মারা একটি বিষয়গত চরিত্র হিসেবে দেখা দেয়, কারণ নিজেদের সমগ্র শ্রমের সঙ্গে উৎপাদকদের সম্পর্কটা তাদের কাছে তাদের নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে নয়, বরং তাদের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে উপস্থিত করা হয় ।...এক্ষেত্রে, পণ্যরূপে বস্তুর অস্তিত্ব এবং শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যগুলোর মধ্যে যে মূল্য সম্পর্ক সেগুলোকে পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করে, তাদের সঙ্গে পণ্যের বস্তুসত্তার এবং তজ্জনিত বাস্তব সম্পর্কের কোনোই সম্বন্ধ নেই। ওখানে যে সম্পর্কটা স্পষ্টতই মানুষ-মানুষে সুনির্দিষ্ট একটা সামাজিক সম্পর্ক, সেটা তাদের চোখে বস্তুতে-বস্তুতে সম্পর্কের এক উদ্ভট রূপ পরিগ্রহ করে। কাজেই উপমার জন্য বাধ্য হয়ে কুহেলিকাময় ধর্ম-জগতের শরণাপন্ন হচ্ছি। সে জগতে, মানুষের মস্তিষ্কজাত ভাবগুলো স্বতন্ত্র জীবন্ত সত্তার মূর্তি ধারণ করে এবং যেন পরস্পরের সঙ্গে ও মনুষ্যজাতির সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে। এই রকমটিই ঘটে পণ্যজগতে মানুষের হাতে গড়া জিনিসের বেলায়। আমি একেই বলি পণ্যপূজা, মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য যখনই পণ্যে পরিণত হয়েছে তখনই তা এর দ্বারা আবৃত হয়েছে, কাজেই এটা পণ্যোৎপাদনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। (*ক্যাপিটাল* ১, পৃ. ১০১-১০২, মস্কো)

সংক্ষেপে, পুঁজিবাদ এমন এক জগৎ যেখানে বিষয় আর বিষয়ী উল্টো হয়ে আছে। এ এমন এক জগৎ যেখানে মানুষ নিজেরই উৎপাদনের হাতে বশীভূত। এর ফলে মানুষের অস্তিত্ব শাসিত হয় অবোধ্য স্বেচ্ছাচারী এক ব্যবস্থা দিয়ে। মানববিষয়ী একটা বিষয় সৃষ্টি করে, সে বিষয় তখন ছদ্ম-বিষয়ী হয়ে যায়। সেই বিষয় তার

নিজ স্রষ্টাকে হাতের পুতুল বানিয়ে ফেলে। শ্রম পুঁজি নিয়োগ করার বদলে যখন পুঁজিই শ্রম নিয়োগ করে, মরা তখন জ্যান্ত হয়ে ওঠে। পুঁজি নামের মরা তখন রক্তচোষা হয়ে জীবিতের রক্ত চুষে বেঁচে থাকে। কারণ পুঁজি নিজে তো মৃত বা জমানো শ্রম ছাড়া আর কিছু নয়:

> তুমি যত কম খাও, কম পান কর, যত কম বই কেনো; যত কম নাটক দেখতে যাও, নৃত্যশালায় যাও, গণমিলনায়তনে যাও; যত কম চিন্তা করো, ভালবাসো, যত কম তত্ত্ব বানাও, কম গান গাও, কম ছবি আঁকো, তোমার সঞ্চয় তত বেশি বাড়বে, তোমার টাকার সিন্দুক তত ফুলে-ফেঁপে উঠবে। এই টাকা পোকাও খাবে না, মরচেও ধরবে না- সেই তোমার পুঁজি। তুমি নিজে যত কম, তোমার জীবনকে যত কম তুমি প্রকাশ কর, তোমার বিজাতীয় জীবন তত বড় আর সেই বিজাতীয় জীবন থেকে পাওয়া তোমার ভাণ্ডারও তত বেশি।...আর তুমি যা করতে পার না তার সব, তোমার টাকা করে দিতে পারে। (১৮৪৪)

জীবিতকে মৃত আর মৃতকে জীবিত করার এই প্রক্রিয়ায় মৃত জীবিতকে আতঙ্কিত করে রাখে। এই অবস্থা বিশেষভাবে প্রকট হয় *সার্বিক পণ্য*, মানে টাকার মাঝে:

> ...টাকা যা কিনতে পারে, টাকার মালিক হিসেবে আমিও তা কিনতে পারি। আমার টাকার ক্ষমতা যত বেশি, আমি তত বেশি শক্তিশালী। টাকার গুণ হলো টাকার মালিকের গুণ আর সেই ক্ষমতা প্রামাণিক। তাই আমি যা আর আমি যা করতে পারি তা কোনোভাবেই আমার ব্যক্তিকতা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। আমি কুশ্রী, কিন্তু আমি সবচেয়ে সুন্দরী নারীকে খরিদ করতে পারি। এর মানে, আমি কুশ্রী নই।

> কেন না, কুশ্রিতার যে দূরে ঠেলে দেয়া প্রভাব, টাকা তা দূর করে দিচ্ছে। ব্যক্তি হিসেবে আমি খোঁড়া, কিন্তু টাকা আমার জন্য ২৪টা পা কিনে আনবে। ফলে আমি আর খোঁড়া থাকব না। আমি বদমাশ, অসৎ, নির্লজ্জ আর বেকুব এক ব্যক্তি, কিন্তু টাকা তো সম্মানের জিনিস, আর তাই টাকার মালিকও শ্রদ্ধার পাত্র। টাকা হলো সবচেয়ে ভালো, আর তাই টাকার মালিকের চাইতে ভালো আর কে আছে? (১৮৪৪)

মার্কস বলছেন, টাকা হলো সর্বজনীন বেশ্যা, মানুষ ও জনগণের সর্বজনীন ব্যভিচারের দূত, এক রকমের বিকৃত ভাষা যেখানে সমস্ত মানব ও স্বাভাবিক গুণ মাথার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে, যেখানে যেকোনো কিছু জাদুর মতো অন্য যেকোনো কিছুতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

নারী ও পুরুষ তাদের জগৎ ফেরত নেয়া, তাদের সংবেদনের শরীর, তাদের জীবন-ক্রিয়া এবং তাদের মাঝের সাধারণ সত্তা তাদের কাছে ফেরত আসাকে মার্কস বলছেন কমিউনিজম। কমিউনিজম সেই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে আমরা আমাদের ছিনতাই হয়ে যাওয়া সত্তাকে আবার নিজের মাঝে ধারণ করতে পারব, শ্রেণি সমাজের অধীনে যে ক্ষমতাগুলো আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে সেগুলো আবার ফিরে পাব। যদি উৎপাদনের মাধ্যমগুলো সাধারণ মালিকানায় গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে আমরা একসঙ্গে যে জগৎ তৈরি করব তা হবে আমাদের সবার, আর প্রত্যেকের নিজেকে উৎপাদন করা হবে সবার নিজেকে বাস্তবায়নের অংশ।

ইতিহাস

মার্কস যদি দার্শনিক হন, তাহলে তিনি কিসের দার্শনিক? নিঃসন্দেহে *মানব অস্তিত্বর* মতো জাঁকালো কিছুর নন, আবার রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের মতো সংকীর্ণ কিছুরও নন। তাঁর চিন্তা কোনো ধরনের মহাজাগতিক তত্ত্ব তৈরির চেষ্টা করেনি, যেমনটা সম্পূর্ণ জীবন দর্শন বলে দাবি করে ধর্ম করতে চায়। এটা সত্য যে, তাঁর সহযোগী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নামে পরিচিত এক ব্যাপক উচ্চাভিলাষী তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন। এই তত্ত্ব পদার্থবিদ্যা থেকে জীববিদ্যা হয়ে ইতিহাস ও সমাজ— সবকিছুকে এক সূত্রে গাঁথতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্কসের নিজের লেখায় বরং অনেক বিনয়ী আর সীমিত একটা উদ্যোগের দেখা মেলে। সেখানে তিনি সেই প্রধান সামাজিক অসংগতিগুলো চিহ্নিত, অনাবৃত করতে চাইছেন যেগুলো বর্তমানে আমাদের সমস্ত মরমী ও শারীরিক ক্ষমতা নিয়ে সত্যিকারের মানব জীবন যাপন করতে বাধা দিচ্ছে।

তবে সেই ভবিষ্যতে কী হবে সেই ব্যাপারে তিনি খুবই কম বলেন, কারণ তাঁর মতে সেই ভবিষ্যৎ প্রক্রিয়া হবে যথার্থ মানব ইতিহাসের শুরু। সেই ভবিষ্যৎ আমাদের বর্তমান ভাষার চৌহদ্দির বাইরে। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের শ্রেণি সমাজের একের পর এক আসা-যাওয়া মার্কসের কাছে নিছক *প্রাক-ইতিহাস*। আর যেহেতু

মার্কসের নিজের কাজ এই যুগেরই সৃষ্টি বলে অবধারিতভাবেই এই কালের চিন্তার ধরন আর জীবনধারার ওপর নির্ভরশীল, সেহেতু নিজ ঐতিহাসিক যুক্তি অনুযায়ীই তাঁর নিজ কাজও তাঁর কালকে লাফিয়ে পার হয়ে কোন কল্পরাজ্য কল্পনা করতে পারে না। এই ধরনের কল্পরাজ্যের বিরোধিতার ব্যাপারে মার্কস ছিলেন অটল। ভবিষ্যৎ সমাজের আদর্শ ব্লুপ্রিন্ট বানানোর দায়িত্বও তিনি নেননি। বর্তমানের বাস্তব সংঘাতগুলোর বিশ্লেষণ আর উদ্‌ঘাটনই ছিল তাঁর কাজ। তিনি কোনো আদর্শ রাষ্ট্র খুঁজছিলেন না। আদর্শ রাষ্ট্র ব্যাপারটাই তাঁর কাছে স্ববিরোধী।

এর মানে আবার এই নয় যে, মার্কস নিছক বর্তমানের একজন রাজনৈতিক তাত্ত্বিক। যে সংঘাতগুলোকে তিনি আমাদের সকল প্রাচুর্য, উপভোগ আর ব্যক্তিবৈচিত্রসহ সত্যিকারের এক ইতিহাস শুরু করতে বাধা দিচ্ছে বলে দেখতে পাচ্ছেন, সেগুলো তাঁর কাছে আরো বড় কোনো নেরেটিভের একটা অংশ। এভাবে তিনি প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রী বা সমাজবিজ্ঞানী নন। আর আমরা তো আগেই দেখেছি যে দার্শনিক তো তিনি ননই! তিনি বরং আমাদের সামনে তুলে ধরছেন খোদ ইতিহাসের এক তত্ত্ব অথবা আরো যথাযথভাবে বললে! বৃহত্তর ঐতিহাসিক পরিবর্তনের গতিবিদ্যা। এই দর্শনই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হিসেবে পরিচিত হয়েছে।

মার্কস তাহলে ইতিহাসকে কিভাবে বিকশিত হিসেবে দেখতে পান? কখনও কখনও ভাবা হয় যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রে আছে সামাজিক শ্রেণির ধারণা। কিন্তু এই ধারণা মার্কস আবিষ্কার

করেননি আর এটা তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোর মধ্যে পড়েও না। বরং এটা বলা আরো সঠিক হবে যে, শ্রেণি সংগ্রামের ধারণা তাঁর কাজের প্রাণকেন্দ্রের কাছাকাছি বিরাজ করে। এই ধারণা বলছে যে, বিভিন্ন সমাজ শ্রেণি তাদের সংঘাতপূর্ণ বস্তুগত স্বার্থের নিরিখে এক পারস্পরিক বৈরিতার মাঝে থাকে। *কমিউনিস্ট ইশতেহারে* তিনি যেমন লিখছেন: *এখন পর্যন্ত বিদ্যমান সমস্ত সমাজের ইতিহাস হলো শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস*। কিন্তু এমন কি এই ব্যপক বিবৃতিও আমাদেরকে তাঁর চিন্তার ঠিক মর্মস্থলে নিয়ে যায় না। কারণ, আমরা এখানে প্রশ্ন করতেই পারি যে, কেন সমাজের শ্রেণিগুলোকে এই স্থায়ী যুদ্ধাবস্থায় থাকতে হয়? আর এখানে মার্কসের উত্তরে বস্তুগত উৎপাদনের ইতিহাসের কথা আসে।

এখানে তাঁর মূল ধারণা হলো *উৎপাদন ধরন* (mode of production), যা দিয়ে তিনি বোঝান উৎপাদনের নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কসহ উৎপাদনের নির্দিষ্ট শক্তির এক ঐতিহাসিক নির্দিষ্ট সমন্বয়। *শক্তি* বলতে তিনি বোঝান মানব শ্রম ক্ষমতাসহ কোন সমাজে সুলভ বিভিন্ন উৎপাদনের উপায়। মূল্য উৎপাদনে সক্ষম যান্ত্রিক তাঁত বা কম্পিউটার একটা উৎপাদনী শক্তি। কিন্তু এরকম বস্তুগত শক্তি আবিষ্কার, বিকাশ আর কাজে লাগানো যায় উৎপাদনের নির্দিষ্ট সমাজ সম্পর্কের কাঠামোর ভেতরেই। এর মাধ্যমে মার্কস মূলত যারা উৎপাদনের মাধ্যমের মালিক ও নিয়ন্ত্রক এবং যে অ-মালিকদের শ্রম ক্ষমতা তাদের কাছে নিবেদিত হয়, এই দুই পক্ষের সম্পর্কের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। মার্কসের এক পাঠ

অনুসারে, ইতিহাস এগিয়ে যায় উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্কের একে অপরের সাথে সংঘাতে আসার মাধ্যমে:

> সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তি বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায় এলে তার সঙ্গে সংঘাত লাগে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের, অর্থাৎ, আইনানুগ ভাষা ব্যবহার করলে বলতে হয়, সংঘাত লাগে এতদিন যে সম্পত্তি-সম্পর্কের মধ্যে থেকে উৎপাদন-শক্তি সক্রিয় ছিল তারই সঙ্গে। সে সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের রূপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় উৎপাদন-শক্তির শৃঙ্খলে। তার পর শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের এক যুগ। (*অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে*, ভূমিকা, ২৫, র.স. ২)

এই পদ্ধতিতেই এক ধরনের উৎপাদন অন্য ধরনের জন্য পথ ছেড়ে দেয়। মার্কসের মতে এই রকম প্রথম ধরন ছিল গোত্রীয়:

> এটা উৎপাদনের অবিকশিত পর্বের প্রতিষঙ্গী, সেই পর্বে কোন লোকসমষ্টি জীবনধারণ করে শিকার করে আর মাছ ধরে, পশুপালন করে কিংবা, সর্বোচ্চ পর্বে, কৃষিকাজে। বিপুল পরিমাণ অনাবাদি জমি থাকে, এটা বোঝায় শেষোক্ত ক্ষেত্রে। এই পর্বে শ্রমবিভাগ তখনো নিতান্ত প্রাথমিক, সেটা পরিবারে বিদ্যমান স্বাভাবিক শ্রমবিভাগের আরো প্রসারে গণ্ডিবদ্ধ। কাজেই সামাজিক গঠনটা পরিবারের কিছু প্রসারে সীমাবদ্ধ; গোষ্ঠীগত পারিবারিক গোষ্ঠীপতিরা, তাদের নিচে গোষ্ঠীর সদস্যরা, শেষে দাসেরা। (*ভাবাদর্শ*,পৃ.২১)

এখান হতে ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠে উৎপাদনের *আদিম ধরন*:

> যেটা আসে বিশেষত চুক্তি কিংবা যুদ্ধজয়ের ফলে কয়েকটা গোষ্ঠী সম্মিলিত হয়ে নগরী স্থাপন করা থেকে, তখনও সেটার সঙ্গে সঙ্গে থাকে দাসত্ব। সম্প্রদায়গত মালিকানার পাশাপাশি তখনই অস্থাবর এবং পরে স্থাবর ব্যক্তিগত সম্পত্তিও গড়ে উঠতে দেখা যায়, কিন্তু সেটা সম্প্রদায়গত মালিকানার অধীন একটা অস্বাভাবিক আকার হিসেবে। নাগরিকেরা তাদের মেহনতি দাসদের ওপর আয়ত্তি খাটায় কেবল তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে, কাজেই একমাত্র এজন্যই তারা সম্প্রদায়গত আকারের মালিকানার সঙ্গে আবদ্ধ। সম্প্রদায়গত মালিকানার ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজের সমগ্র গঠন এবং তার সঙ্গে লোকসমষ্টির ক্ষমতা বিশেষত যে পরিমাণে ব্যক্তিগত স্থাবর সম্পত্তি গড়ে ওঠে সেই একই পরিমাণে ক্ষয়ে যায়। (*ভাবাদর্শ*, পৃ.২৩)

এটা হতে পরিণামে তৈরি হয় উৎপাদনের সামন্ততান্ত্রিক ধরন:

> গোষ্ঠীগত এবং সম্প্রদায়গত মালিকানার মতো এটার আবার ভিত্তি হলো একটা সম্প্রদায়; কিন্তু এটার বিপরীতে স্থাপিত সরাসরি উৎপাদক শ্রেণি নয় দাসেরা, যেমনটা ছিল প্রাচীন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, সেটা হল ভূমিদাসে পরিণত করা ছোট কৃষককুল। সামন্ততন্ত্র যেইমাত্র পূর্ণ বিকশিত হলো অমনি আরও দেখা দিল শহরের প্রতি বৈরিতা। ভূমি-মালিকানার স্তরবিভক্ত গঠন এবং সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র অনুচরবর্গগুলো ভূমিদাসদের ওপর অভিজাতকুলের আয়ত্তি জোগাল। প্রাচীন সম্প্রদায়গত মালিকানাটা যতখানি ঠিক সেই পরিমাণেই এই সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন হলো একটা বশীভূত উৎপাদক শ্রেণির বিরুদ্ধে একটা পরিমেল; কিন্তু

> উৎপাদনের পৃথক পরিবেশের দরুন এটার পরিমেলের আকার এবং সরাসরি উৎপাদকদের সঙ্গে সম্পর্ক অন্য রকম। (*ভাবাদর্শ*, পৃ.২১)

সামন্তীয় ভূমিভিত্তিক তালুকের সঙ্গে শহরে গড়ে ওঠে কারবারি গিল্ড। এই গিল্ডগুলোতে ছিল ছোট মাত্রায় উৎপাদন ও সামান্য শ্রম বিভাজন। কিন্তু সীমিত গিল্ড ব্যবস্থাসহ সামন্ততন্ত্রের সমাজ-সম্পর্ক শহরের উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ আটকে রাখা শুরু করল। মধ্যবিত্ত শ্রেণি শেষে রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে এই সংকীর্ণ জায়গা ভেঙে এক মহাকাব্যিক মাত্রায় উৎপাদনী শক্তিকে মুক্ত করে।

তবে পরে, পুরো সেয়ানা শিল্প পুঁজিতান্ত্রিক শ্রেণি হয়ে গিয়ে এই একই বুর্জোয়ারা দেখল যে, অতিবৈষম্য, অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব, কৃত্রিম অভাব এবং পুঁজির বিকাশ না করে তারা আর ওই শক্তিগুলোকে বাড়াতে পারছে না। এভাবে তা শ্রমিক শ্রেণির কাছে নিজের জায়গা ছেড়ে দেয়ার জমিন তৈরির কাজ শুরু করে। এখানে শ্রমিক শ্রেণির কাজ হলো উৎপাদনের উপায়ের নিয়ন্ত্রণ দখল করে সবার স্বার্থে তা পরিচালিত করা:

> রূপান্তর সাধনের এই ধারা যখনই পুরোনো সমাজকে আপাদমস্তক যথেষ্ট পরিমাণে পচিয়ে ফেলে, যখনই মেহনতকারীরা প্রলেতারিয়েতে পরিণত হয়, তাদের শ্রমের উপায়গুলো যখনই পর্যবসিত হয় পুঁজিতে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা যখনই নিজের পায়ে দাঁড়ায়, তখনই শ্রমের আরো সমাজীকরণ এবং ভূমি ও উৎপাদনের অন্য

> উপায়গুলোর সমাজ-নিয়োজিত উৎপাদনের উপায়গুলোতে, অর্থাৎ সাধারণ উপায়গুলোতে আরো রূপান্তর সাধন, তথা ব্যক্তিগত মালিকদেরও আরো উচ্ছেদ সাধন এক নতুন রূপ নেয়। যে শ্রমকারী নিজের জন্য কাজ করছে এবার তাকে উচ্ছেদের কথা নয়, এবার যে পুঁজিপতি বহু শ্রমিকের শোষক তাকেই উচ্ছেদ করতে হবে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্তর্লীন নিয়মের ক্রিয়াতেই, পুঁজির কেন্দ্রীকরণের ফলেই এই উচ্ছেদ সাধিত হয়। একজন পুঁজিপতি সবসময়েই বহু পুঁজিপতিকে শেষ করে। (*ঐতিহাসিক ঝোঁক*, ১২৩-১২৪, র.স.২)

অন্যভাবে বললে, পুঁজিবাদ শ্রমের সামাজিকীকরণ আর পুঁজি কেন্দ্রীভূত করে নিজেই নিজেকে বিলোপের পথ তৈরি করে:

> এই কেন্দ্রীকরণ বা স্বল্পসংখ্যক পুঁজিপতি দ্বারা বহু পুঁজিপতির এই উচ্ছেদসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমবর্ধমান আকারে বিকাশ লাভ করতে থাকে শ্রম প্রক্রিয়ার সমবায় রূপ, বিজ্ঞানের সচেতন কারিগরি প্রয়োগ, পরিকল্পিত জমিচাষ, শ্রমের যন্ত্রপাতির এমন যন্ত্রপাতিতে রূপান্তর যা শুধু সমষ্টিগতভাবেই ব্যবহার করা চলে, যৌথ সমাজীকৃত শ্রমের উৎপাদনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে উৎপাদনের সকল উপায়ের মিতব্যয়ীকরণ, বিশ্ববাজারের জালে সব জাতির বিজড়ন আর সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী আমলের আন্তর্জাতিক চরিত্র। (*ঐতিহাসিক ঝোঁক*, ১২৪, র.স. ২)

তাহলে পুঁজিবাদই নিজের একজোট দুশমনের, পরিহাসের মধ্য দিয়ে নিজের গোরখোদকদের, মানে শ্রমিকদের জন্ম দেয়:

যে সকল ধনকুবের এই রূপান্তরসাধন-ক্রিয়ার সবটুকু সুবিধা জবরদখল করে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে, তাদের সংখ্যা যেমন ক্রমাগত কমতে থাকে, তারই সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে দারিদ্র্য, নিপীড়ন, দাসত্ব, অধঃপতন ও শোষণের পুঞ্জীভূত পরিমাণ, কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির বিদ্রোহও বাড়তে থাকে। সে শ্রেণির সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। পুঁজিবাদী উৎপাদনক্রিয়ার ব্যবস্থাতেই সে শ্রেণি হয়ে ওঠে সুশৃংঙ্খল, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত। পুঁজির একচেটিয়া ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ও তারই নেতৃত্বে উৎপাদনের যে পদ্ধতির উদ্ভব ও উন্নতি হয়েছে, সে পদ্ধতির পথে শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়ায় সেই একচেটিয়া ব্যবস্থা। উৎপাদনের উপায়গুলোর কেন্দ্রীকরণ আর শ্রমের সামাজীকরণ শেষ পর্যন্ত এমন এক বিন্দুতে গিয়ে পৌছায় যেখানে পুঁজিবাদী খোলসের সঙ্গে তা আর খাপ খায় না। খোলসটা ফেটে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যুঘণ্টা বাজে। উচ্ছেদ ঘটে উচ্ছেদকারীর। (*ঐতিহাসিক ঝোঁক*, ১২৪, র.স. ২)

এভাবে বললে সর্বহারা বিপ্লবের পুরো প্রক্রিয়া অভাবনীয় রকম স্বয়ংক্রিয় শোনায়। মার্কসের চিন্তার এই সংস্করণে, শাসক শ্রেণির উত্থান ও পতন ঘটে উৎপাদন শক্তিকে বিকশিত করায় তাদের সক্ষমতা অনুসারে। আর এক উৎপাদন ধরন (আদিম সাম্যবাদ, দাসতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র) এভাবে নিজের অন্তর্নিহিত লজিক দিয়ে আরেকটিতে পরিবর্তিত হয়। এখানে আমরা মার্কসের নৃবিজ্ঞানের এক ধরনের ইতিহাস আশ্রিত সংস্করণ পাচ্ছি: মানব বিকাশ হচ্ছে ইতিবাচক, আর যা কিছু এই প্রক্রিয়া ঠেকিয়ে রাখে

তাই নেতিবাচক। কিন্তু এই মডেলকে কী করে মার্কসের কাজের সেই অংশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়, যেখানে তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, যা কেন্দ্রে আছে তা উৎপাদন শক্তি নয় বরং উৎপাদন সম্পর্ক, যেহেতু শাসক শ্রেণি উৎপাদন শক্তি বিকশিত করে নিজ স্বার্থে এবং নিজেদের স্বার্থে শোষণের উদ্দেশ্যে, যেহেতু এই প্রক্রিয়া নিয়ে যায় অধীনস্থ শ্রেণির বঞ্চনার দিকে, এই মডেলে রাজনৈতিক বিপ্লব সরাসরি আসে শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আর তা উৎপাদন শক্তিকে তাদের সামাজিক বাধা থেকে মুক্ত করার কোনো সাধারণ আন্তঃঐতিহাসিক তাড়না থেকে হয় না। শ্রেণি সংঘাতই ইতিহাসের চালক, কিন্তু তাকে বস্তুগত উৎপাদনের কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

তাঁর প্রধান কাজ *ক্যাপিটালে* তো বটেই, অন্যত্রও মার্কসের বিশেষ মনোযোগ ছিল স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কালের উৎপাদন ধরনের ওপর। এই ব্যবস্থায় নিজের শ্রমক্ষমতা (বা শ্রমশক্তি) ছাড়া আর কোনো কিছু না থাকা শ্রমিক কোনো পুঁজির মালিকের কাছে সেই ক্ষমতা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। পুঁজির মালিক তখন সেই ক্ষমতা নিজের মুনাফার কাজে লাগায়। মানুষ নিজেই এমন পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায় যাকে বাজারে আর সব পণ্যের মতো বদলানো যায়। পুঁজিপতি তখন শ্রমিকের শ্রমক্ষমতা ভাড়া করে, মানে শ্রম নামের পণ্যের বিপরীতে মজুরি দেয়। মজুরি হলো সেই দাম যা শ্রমিকের শ্রমক্ষমতা পুনরুৎপাদনের জন্য তার দরকার হয়, মানে তাঁর বেঁচে থাকা আর কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মাল-সামান। কিন্তু শ্রমক্ষমতা কখনোই স্থির কোনো বিষয় নয় বরং

মানবশক্তি এবং সম্ভাবনার ব্যাপার। এ কারণে শ্রমক্ষমতা এমন এক অদ্ভুত পণ্য যা সর্বদা প্রসারিত হয়, যাকে স্থির কোনো মাপে মাপা যায় না। আর একে কাজে লাগিয়ে পুঁজিপতি উৎপাদিত আর বিক্রি করা মালের রূপে বেশি মূল্য তুলে নেয়। এরপর শ্রমিককে মজুরি দেয়া দরকার হয়। মার্কস এই প্রক্রিয়াকে বলছেন শ্রমিক শ্রেণির কাছ হতে *উদ্বৃত্ত মূল্য* শুষে নেয়া। এই প্রক্রিয়া হলো পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ স্বভাবের মূল হাতিয়ার। কিন্তু শ্রমের মজুরির বিনিময় যেহেতু ন্যায্য বলে মনে হয়, তাই এই শোষণ আবশ্যিকভাবেই খোদ বিদ্যমান ব্যবস্থার রুটিন কাজের মাধ্যমেই আড়াল করে রাখা হয়।

তবে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিযোগিতামূলক। এখানে প্রত্যেক উৎপাদককে তার পুঁজি বাড়াতে হয় নয়তো পিছিয়ে পড়তে হয়। মার্কসের মতে, এই প্রক্রিয়ার একটা ফল হলো মুনাফার হার পতন, যা ডেকে আনে কুখ্যাত মন্দা, আজ পর্যন্ত এই ব্যবস্থার এটা একটা বৈশিষ্ট্য। এভাবে এই ব্যবস্থার সংঘাত তীক্ষ্ণ হয়, আর সেই সাথে তীক্ষ্ণ হয় শ্রেণি সংগ্রাম। কারণ পুঁজি নিজের স্বার্থে শ্রমিকের শ্রমের ফল যথা মুনাফার আকারে যথাসম্ভব বেশি আত্মসাৎ করে আর শ্রমিকের নিজ শ্রম যতটা অর্জন করেছে সেটাও তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। মার্কসের মতে, এই অচলাবস্থার একমাত্র চূড়ান্ত সমাধান হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। যেহেতু শ্রমিক শ্রেণি খোদ পুঁজিকেই দখলচ্যুত করে এর ওপর নিজের সমষ্টিগত নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করে এবং মুষ্টিমেয়র লাভের বদলে একে সবার প্রয়োজনে কাজে লাগায়।

মার্কসবাদ কোন নৈতিকতাবাদ নয়। তা পুঁজিপতিদের খারাপ লোক বলে খারিজ করে শ্রমিকদের মহিমান্বিত করে না। এর লক্ষ্য বরং ঐতিহাসিক পরিবর্তনের একটা *বৈজ্ঞানিক* তত্ত্ব, যেখানে কোনো শাসক শ্রেণিকেই দ্ব্যর্থহীনভাবে ইতি বা নেতিবাচক বলা যাবে না। এক পাঠ অনুসারে, একটা শ্রেণি উৎপাদন শক্তিগুলোকে যতক্ষণ বিকশিত করতে পারে ততক্ষণ তা *প্রগতিশীল*। এর এই মানেও দাঁড়াতে পারে যে দাস ব্যবস্থা তার কালে প্রগতিশীল ধরন ছিল। এই কথাটা স্পষ্টভাবে আমাদের ন্যায্যতার (justice) অনুভূতিকে আহত করবে। কিন্তু মার্কস নিজে মনে হয় কখনো কখনো ন্যায্যতার ধারণাগুলোকে শোষণ আড়াল করা বুর্জোয়া ভাবাদর্শ বলে গণ্য করেছেন। তবে এ-ও ঠিক যে তাঁর নিজের কাজ এক ন্যায্য সমাজ চাওয়ার আবেগ দিয়ে উদ্দীপিত। বুর্জোয়ারা আজ হয়তো মুক্তি, ন্যায্যতা আর সবার কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধকতা, কিন্তু তার পূর্ণবিকাশের কালে সে ছিল বিপ্লবী শক্তি যে তার সামন্তীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছুঁড়ে ফেলেছে। এই পুঁজিতন্ত্রই ন্যায্যতা ও স্বাধীনতার মতো ভাবনাগুলো অর্পণ করে গেছে তার সমাজতান্ত্রিক উত্তরসূরির হাতে। এরাই উৎপাদন শক্তিগুলোকে এমন মাত্রায় বিকশিত করেছে যেখানে সমাজতন্ত্র হয়তো এখন এক সম্ভব প্রকল্প হয়ে উঠতে পারে। কারণ, পুঁজিবাদের হাতে বিকশিত বস্তুগত ও মরমি সম্পদ ছাড়া সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়। যে সমাজতন্ত্রকে গোড়া থেকে উৎপাদন শক্তিগুলোকে বিকশিত করে আসতে হয়, যেখানে তার হয়ে এই কাজ পুঁজিপতি শ্রেণি করে রেখে যায়নি, সেই সমাজতন্ত্রে স্তালিনবাদের মতো স্বৈরতান্ত্রিক ধরনের রাষ্ট্রক্ষমতার

দিকে গিয়ে ঠেকার প্রবণতা দেখা দেবে। আর যে সমাজতন্ত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছ হতে উদার স্বাধীনতা আর নাগরিক প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার পেতে ব্যর্থ হবে, সে কেবল সেই স্বৈরতন্ত্রই আবার কায়েম করবে। বুর্জোয়ারা হয়তো ব্যক্তিগত লাভের মতো ক্ষুদ্র স্বার্থের জায়গা থেকে যা করার তা করেছে, তবে সমষ্টিগতভাবে নিলে তা খুব দক্ষভাবে উৎপাদন শক্তিগুলোকে এমন জায়গায় এনেছে যে, সেগুলোকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঢেলে সাজালে তা দিয়ে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য আর বঞ্চনা মুছে ফেলা যাবে।

তবে বিপ্লবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্জন শুধু বস্তুগত ছিল না। ব্যক্তিকে জটিল বিকাশের নতুন উচ্চতায় আনতে গিয়ে সে এমন এক মানবিক সম্পদ উন্মোচন করেছে যার জন্য সমাজতন্ত্র স্থায়ীভাবে ঋণী থাকবে। মার্কসবাদ চমৎকার কিছু সামাজিক আদর্শ ভেবে বের করার ব্যাপার নয়। মার্কসবাদের মানে বরং এই প্রশ্ন করা যে, চমৎকার যে সব আদর্শ ইতিমধ্যেই আমাদের আছে, সেগুলো কেন সবার জন্য কাজে লাগানো যায় না। মার্কসবাদ সেই বস্তুগত অবস্থা সৃষ্টি করার কাজ হাতে নিয়েছে এই আদর্শগুলো হয়তো বাস্তব হবে। এ রকম একটা শর্ত হলো এই সত্য যে, বুর্জোয়ারা হলো প্রথম খাঁটি সার্বিক সমাজ-শ্রেণি যারা সমস্ত সংকীর্ণ দেয়াল ভেঙে সত্যিকারের এক বৈশ্বিক যোগাযোগ জন্ম দিয়েছে, যা হয়তো এক আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ভিত্তি গঠন করবে।

শ্রেণি ইতিহাসের সত্যিকারের দ্বন্দ্বতত্ত্ব তাহলে সংগ্রাম করে একই সঙ্গে এর মুক্তিদাতা এবং উৎপীড়ককে একটি একক যুক্তির

উপাদান হিসেবে উপলব্ধি করতে। মার্কস এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁর প্রাঞ্জল গদ্যে তুলে ধরছেন:

> আমাদের এ যুগে যেন সবকিছুর গর্ভেই তার বিপরীতের অস্তিত্ব। মানব-শ্রম লাঘবের ও ফলে তাকে ফলবান করার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী যে যন্ত্র, সে যন্ত্রকে আমরা দেখছি মানব-শ্রমকেই উপবাসী রাখছে, তাকে অতিরিক্ত খাটাচ্ছে। সময়ের নতুন উদ্ভাবিত উৎসগুলো যেন কোনো অদ্ভুত অপ্রাকৃত মায়ায় অভাবের কারণে পরিণত হচ্ছে। শিল্পকলার জয়যাত্রার মূল্য দিতে হচ্ছে যেন চরিত্রহীনতা দিয়ে। যে গতিতে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করছে, সেই গতিতেই যেন মানুষ অন্য মানুষের বা তার নিজেরই কলঙ্কের দাসে পরিণত হচ্ছে। এমনকি, বিজ্ঞানের পবিত্র আলোকও যেন অজ্ঞতার কালো পটভূমি ছাড়া দীপ্তি পায় না। আমাদের সমস্ত আবিষ্কার ও প্রগতির ফল যেন দাঁড়াচ্ছে বৈষয়িক শক্তিসমূহকে মানসক্রিয়ায় ভূষিত করা এবং মানবজীবনকে বৈষয়িক শক্তির স্তরে নামিয়ে আনা। একদিকে আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞান এবং অপরদিকে বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা ও অবক্ষয়ের এই যে বিরোধ, আমাদের যুগে উৎপাদন-শক্তি ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যকার এই বিরোধ এমন এক সত্য যা জাজ্বল্যমান, সর্বগ্রাসী, অবিসংবাদী। (*জনগণের সংবাদপত্র*, ২০-২১, *র. স.* ২)

জিনিস সম্পর্কে ধারণা করতে গিয়ে মার্কস দেখতে পাচ্ছেন যে, এর মর্মদেশে আছে পরিহাস, উল্টো করে দেখানো, বাক্যালংকার, পরস্পর বিরোধ, অসংগতি। পুঁজিতান্ত্রিক শ্রেণি এমন এক সমাজ সম্পর্কের পটভূমিতে ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সম্পদ জড়ো করেছে,

যেখানে তার অধিকাংশ অধীনস্থই ক্ষুধার্ত, লাঞ্ছিত আর নিপীড়িত। এই পটভূমিতে এমন এক সমাজব্যবস্থা জন্ম নিয়েছে যেখানে সহযোগিতা আর একসঙ্গে কাজ করার বদলে বাজারের মধ্যে শত্রুতা করতে গিয়ে প্রতিটি ব্যক্তি একে অপরের বিরুদ্ধে লাগে। এখানে আগ্রাসন, আধিপত্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ হচ্ছে সময়ের নিয়ম। পুঁজিবাদ হচ্ছে দখলবাজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস। এখানে প্রতিটি মানুষ নিজেই মালিক হয়ে নিজেকেই একমাত্র সত্য ভাবে। অপর মানুষদের তার কাছে যাওয়ার সমস্ত দরজা তালাবন্ধ। আশপাশের মানুষকে এই ধান্দাবাজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেখে স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে। মার্কস কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধী নন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কোন অবয়বহীন সামষ্টিকতায় তিনি মিলিয়ে দিতে চান না। তাঁর উদ্দেশ্য বরং পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তি ক্ষমতার স্তরে সকল নারী ও পুরুষের মাঝের সম্প্রদায়গত বন্ধন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, *কমিউনিস্ট ইশতেহারে* তিনি যেমন বলছেন, *প্রত্যেকের মুক্ত বিকাশ অবশ্যই হয়ে উঠতে হবে সবার মুক্ত বিকাশের শর্ত*। আর তা অর্জিত হতে পারে কেবল ব্যক্তিসম্পত্তি বিলোপের মাধ্যমে।

অনিবার্যভাবেই এই সাহসী তত্ত্বে কিছু সমস্যা আছে। এর মধ্যে একটা হলো, সমাজ-শ্রেণি বলতে মার্কস ঠিক কী বোঝাচ্ছেন, তা স্পষ্ট নয়। মার্কসের ব্যাখ্যাকারীদের মাঝে একটা কৌতুক চালু আছে যে, যখনই তিনি কোনো ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করতে শুরু করেন, ওইখানেই তিনি থেমে অন্য কিছু শুরু করেন। তবে এটা পরিষ্কার যে, শ্রেণিকে তিনি প্রাথমিকভাবে দেখেন অর্থনৈতিক

ক্যাটাগরি হিসেবে। মোটাদাগে বলতে গেলে, এটা তাদের কথা বোঝায়, যারা উৎপাদন ধরনের সাপেক্ষে একই সম্পর্কের কাতারে দাঁড়ায়। ফলে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কৃষক ও কারিগরকে একত্রে *পেটি বুর্জোয়া* হিসেবে কাতারভুক্ত করা যায়, যেখানে যারা শ্রম ক্ষমতা বিক্রি করতে বাধ্য, তাঁরা পড়েন সর্বহারা নামের আরেক কাতারে। তাহলে কি কোটিপতি চিত্রতারকা আর রাস্তার টোকাই দুজনেই শ্রমিক শ্রেণির অংশ? নাকি রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক ও ভাবাদর্শিক ফ্যাক্টরগুলোও ক্যাটাগরির মাঝে ঢুকতে দেয়া উচিত? সমাজ, শ্রেণি এবং অপর মানব গোষ্ঠীপ্রবণতার (জাতীয়তা, নৃতাত্ত্বিক বা লিঙ্গগত) মাঝের সম্পর্ক বা অ-সম্পর্কগুলো কী? মার্কস নিজে এসবের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়ার সময় পাননি। কোনো শ্রেণিকে শ্রেণি হতে হলে কি শ্রেণি হিসেবে সচেতন হতেই হবে? এই প্রশ্নটা মার্কস লুই বোনাপার্তের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারে ফরাসি চাষিদের নিয়ে আলোচনায় বিবেচনা করেছেন:

> ক্ষুদে মালিক কৃষক সম্প্রদায় একটি বিশাল জনসমষ্টি, তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রা একই ধরনের, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে বহুবিধ সম্পর্ক স্থাপন এরা করে না। তাদের উৎপাদন-প্রণালি পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের বদলে লোকদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।...লক্ষ লক্ষ পরিবার যখন এমন আর্থিক অবস্থায় জীবনযাপন করে যার ফলে তাদের জীবনযাত্রার ধরন, তাদের স্বার্থ ও সংস্কৃতি অন্যান্য শ্রেণি থেকে স্বতন্ত্র হয় এবং শেষোক্তদের প্রতি তাদের বৈরীভাব জাগিয়ে তোলে, তখন সে দিক থেকে তারা একটি শ্রেণি বটে। এই ছোট ভূসম্পত্তির মালিক চাষিদের

> মধ্যে যোগাযোগ যে পরিমাণে স্থানীয় মাত্র, এবং স্বার্থের অভিন্নতা তাদের ভেতর যে পরিমাণে কোনো যৌথসত্তা, জাতিগত বন্ধন অথবা রাজনৈতিক সংগঠন এনে দেয়নি, সেই পরিমাণে তারা আবার শ্রেণি নয়। (*বোনাপার্ট*, ৩২৯, র. স. ১)

ঐতিহাসিক পরিবর্তনের তত্ত্বের ক্ষেত্রে: মার্কস যদি সত্যিই মনে করেন যে, সব সময় এবং সব ক্ষেত্রে আসল কথা হলো উৎপাদনশক্তির বিকাশ ঘটানো, তাহলে তিনি পরিবেশবাদী সমালোচনার ঝুঁকির মুখে পড়বেন। আমরাও জিজ্ঞাসা করতে পারি, তিনি এই ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতাকে অনিবার্য বলে বিবেচনা করেন কি না? *কমিউনিস্ট ইশতেহারে* তিনি ঘোষণা করছেন যে, *বুর্জোয়াদের পতন আর সর্বহারার বিজয় সমান রকম অনিবার্য*, আর *ক্যাপিটালে* পুঁজিবাদের নিয়ম প্রসঙ্গে লিখছেন যে এটা, *অনিবার্য ফলাফলের দিকে লৌহকঠিন অপরিহার্যতা নিয়ে কাজ করে* (*ক্যাপিটাল*, খণ্ড ১)। তবে অন্য জায়গায়, ইতিহাস নামে এক অস্তিত্ব আছে যে মানবসত্তার মাঝ দিয়ে নিয়ন্ত্রণবাদী কেতায় পরচালিত হয় - এই ধারণাকে মার্কস বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি:

> ...ইতিহাস কিছুই করে না, এর অধিকারেও কোনো বিপুল সম্পদ নেই, সে কোনো যুদ্ধ লড়ে না। মানুষ, বাস্তব জীবন্ত মানুষই এই সব করে, অধিকার করে, যুদ্ধ লড়ে। ইতিহাস এমন কোনো আলাদা ব্যক্তি নয় যে নিজের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষকে কাজে লাগায়। নিজের উদ্দেশ্যের পিছে

ছুটে চলা মানুষের কাজ ভিন্ন ইতিহাস আর কিছু নয়।
(*পবিত্র পরিবার*)

তিনি এ ধারণাও খারিজ করেন যে, উৎপাদনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ধরন কোন এক বাঁধাধরা নির্ধারিত পথে একইভাবে একটার পর আরেকটা আসতে বাধ্য। মনে হয় তিনি এমনও ভাবেন না যে, উৎপাদন শক্তি সব সময় অপ্রতিরোধ্যভাবে বিস্তার হতেই থাকে। যা-ই হোক, যদি পুঁজিবাদের উচ্ছেদ অনিবার্য হয়, তাহলে শ্রমিক শ্রেণি এই উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য রাজনৈতিকভাবে তৎপর না হয়ে পেছনে বসে অপেক্ষা করবে না কেন? কেউ এই দাবি করতে পারেন যে, শ্রমিক শ্রেণির চেতনা অনিবার্যাভাবেই তার অঙ্গীকার ও বদলানোর ব্রত সম্পন্ন করানোর স্তরে পৌঁছোতে বাধ্য। এমনটা হলে, এই শ্রেণির *স্বাধীন* ক্রিয়া কোনো একভাবে বড় এক নির্ধারণমূলক ন্যারেটিভের আওতায় পড়ে যায়। কিছু খ্রিষ্টান সাধু একইভাবে স্বাধীন ইচ্ছা আর পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের মাঝে আপাত গরমিলের ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মার্কস যখন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন, তখন মনে হয় তিনি বিশ্বাস করেন যে, রাজনৈতিক বিপ্লব নির্ভর করে বিবদমান সামাজিক শক্তিগুলোর সংগ্রামের ওপর, আর এর ফলাফল কী হবে তার কোনো অর্থে ঐতিহাসিক কোনো গ্যারান্টি নেই। ঐতিহাসিক বিধি বলতে কিছু থাকলেও তা হলো মানুষের কাজের মিলিত ফলাফল, মানুষের কাজ হতে স্বাধীন কোনো নিয়তি নয়। মার্কসের *অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারের* এই বিখ্যাত অংশে তিনি বলছেন:

স্বীয় ইতিহাস মানুষই রচনা করে বটে, কিন্তু ঠিক আপন খুশিমতো নয়, নিজেদের নির্বাচিত পরিস্থিতিতে নয়, প্রত্যক্ষবর্তী, অতীত থেকে প্রদত্ত ও আগত পরিস্থিতির মধ্যে। মৃত পূর্বপুরুষদের সমস্ত ঐতিহ্য জীবিত লোকের মাথায় দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসে থাকে।...উনিশ শতকের সমাজ বিপ্লবের কাব্য-প্রেরণা আর অতীত থেকে নয়, আসতে পারে একমাত্র ভবিষ্যৎ থেকে। অতীত সম্পর্কে সমস্ত কুসংস্কার মোচন না করে আর তার নিজের কাজ আরম্ভ করাই সম্ভব নয়। আগেকার বিপ্লবের পক্ষে বিশ্বের অতীত ইতিহাস স্মরণ করা প্রয়োজন ছিল নিজেদের সারবস্তু সম্পর্কে নিজেদের প্রতারণা করার জন্য। নিজের সারবস্তুতে পৌঁছোনোর জন্য উনিশ শতকের বিপ্লবকে মৃতদের সমাধিস্থই রাখতে হবে। (*বোনাপার্ট*, ২৪০, ২৪৩, র. স. ১)

রাজনীতি

মার্কস যদি কোনো ধরনের দার্শনিক হয়েও থাকেন, তাহলেও অধিকাংশ দার্শনিক থেকে তিনি আলাদা। চূড়ান্ত বিচারে একজন ব্যবহারিক দার্শনিক হিসেবে তাঁর ভাবনা তাঁকে অন্য দার্শনিকদের থেকে আলাদা করেছে, সে ভাবনা যতই দুর্বোধ্য হোক না কেন। তাঁর সমস্ত প্রয়াস বাস্তব রাজনৈতিক শক্তির খাতিরে। এই হলো মার্কসের সমাদৃত তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্যের থিসিস। তবে এর সাথে কেউ এই কথাও যোগ করতে পারেন যে, মার্কসের তত্ত্বের একটা উদ্দেশ্য হলো এমন এক সামাজিক অবস্থায় পৌঁছোনো যেখানে চিন্তাকে আর প্রায়োগিক কোনো উদ্দেশ্যের নিছক সহযোগী হয়ে থাকতে হবে না। আর তার পরিবর্তে একে খোদ নিজেই এক আনন্দ হিসেবে উপভোগ করা যাবে।

মার্কসের রাজনৈতিক তত্ত্ব বিপ্লবী। বিপ্লবের সংজ্ঞা তাঁর কাছে যত না সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় গতি, আকস্মিকতা বা সহিংসতা, তারচেয়ে বেশি কোনো দখলকারী শ্রেণিকে অন্য শ্রেণি কর্তৃক উচ্ছেদ ও প্রতিস্থাপন। তবে মনে হয় তাঁর ভাবনায় সমাজতন্ত্র নির্মাণে বিদ্রোহী শক্তি অন্তর্ভুক্ত আছে। আর এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে স্পষ্টতই বেশ ভালো রকমের সময় লাগতে পারে।

আমরা এখানে সমাজতন্ত্রের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করব: এর মাঝে যুক্ত আছে শ্রমিক শ্রেণির ক্ষমতায় আসা, তবে তা করতে গিয়ে তাকে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে, যেখানে সকল শ্রেণি বিলোপ হতে পারে। *একবার যখন উৎপাদনের উপায় সামষ্টিক মালিকানা আর নিয়ন্ত্রণে আসবে খোদ শ্রেণিই তখন শেষে অদৃশ্য হবে।*

> অতীতে যেসব শ্রেণি কর্তৃত্ব পেয়েছে তারা সবাই অর্জিত প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করতে চেয়েছে গোটা সমাজের ওপর তাদের দখলির শর্তটা চাপিয়ে দিয়ে। প্রলেতারিয়েতের পক্ষে তাদের দখলির নিজস্ব পূর্বতন পদ্ধতি উচ্ছেদ না করে এবং তাতে করে দখলির প্রত্যেকটি ভূতপূর্ব পদ্ধতির অবসান না ঘটিয়ে, সমাজের উৎপাদনশক্তির ওপর প্রভুত্ব লাভ সম্ভব নয়; তাদের নিজস্ব বলতে এমন কিছু নেই যাকে রক্ষা অথবা দৃঢ়তর করতে হবে; ব্যক্তিগত মালিকনার সমস্ত পূর্বতন নিরাপত্তা ও নিশ্চিতি নির্মূল করে দেয়াই তাদের ব্রত। (*ইশতেহার*, ৩৬, র. স. ১)

অথবা মার্কস তাঁর প্রথম দিকের রচনায় যেমন লিখছেন:

> এমন একটা শ্রেণি গড়ে উঠতেই হবে যার র‍্যাডিকেল শৃঙ্খল আছে, সিভিল সমাজের মাঝে এমন এক শ্রেণি যা সিভিল সমাজের শ্রেণি নয়, এমন এক শ্রেণি যা সকল শ্রেণির বিলয়, সমাজের এমন এক বিলয় যার সার্বিক চরিত্র আছে কারণ তার যাতনা সার্বিক, এবং যে বিশেষ কোনো প্রতিকারের দাবি করে না কারণ তার প্রতি করা ভুল কোনো বিশেষ ভুল নয় বরং সাধারণ ভুল। সমাজের এমন এক বিলয় গড়ে উঠতেই হবে যে কোনো পরম্পরাগত কোনো মর্যাদা দাবি না

> করে কেবল মানবীয় এক মর্যাদা দাবি করবে... বিশেষ এক শ্রেণি হিসেবে সমাজের এই বিলয়ই হলো সর্বহারা। (অধিকার)

সর্বহারা কেন শেষ ঐতিহাসিক শ্রেণি? এর কারণ *সর্বহারার একনায়কত্বের* মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা এমন এক সমাজ নির্মাণের প্রস্তাবনা দেয় যেখানে উৎপাদন-উপায়ের নিরিখে তাদের যৌথ মালিকানায় সবাই একই সম্পর্কের কাতারে এসে দাঁড়াবে। শ্রমিকের তখন আর কোনো বিশেষ শ্রেণির সদস্য হিসেবে পরিচয় থাকবে না, সবার সরল পরিচয় হবে তাঁরা সমাজ জীবন উৎপাদন আর টিকিয়ে রাখায় অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুষ। পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের এই প্রথম স্তরকে মার্কস বলছেন সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রে সম্পূর্ণ সমতা থাকবে না। আদতে, *সমান অধিকারের* পুরো ধারণাটাকেই মার্কস বুর্জোয়া যুগের উত্তরাধিকার বলে মনে করেন। এই ধারণাতে বিমূর্তভাবে সমান পণ্যের বিনিময়ের এক রকমের মরমি প্রতিফলন ফুটে ওঠে। তার মানে এই নয় যে, তাঁর কাছে সমান অধিকার নামক ধারণার কোনো মূল্য নেই। ব্যাপারটা বরং এই যে, এই ধারণা অনিবার্যভাবে নারী-পুরুষের বিশেষত্ব ও তাদের অনন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভা দাবিয়ে রাখে। এই ধারণা এক রকমের রহস্যময়তা হয়ে নিছক এক আইনি রূপের আড়ালে সামাজিক আসাম্যের সত্যিকারের উপাদানটাকে লুকিয়ে রাখে। মার্কস নিজে শেষ বিচারে সমতার চেয়ে ব্যবধানের

ব্যাপারে বেশি মনোযোগী। সমাজতন্ত্রের অধীনে যা ঘটে তা হলোঃ

> ...একজনের চেয়ে আরেকজনের বেশি শারীরিক বা মানসিক শক্তি থাকে, তাই সে একই সময়ে বেশি শ্রম দিতে পারে, অথবা বেশি কাজ করতে পারে। আবার শ্রমকে মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করতে হলে, তার স্থিতিকাল ও তীব্রতা দিয়েই তার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হবে, নইলে সে আর মানদন্ড থাকে না। এই সমান অধিকার তাই অসমান শ্রমের জন্য অসমান অধিকার মাত্র। এখানে শ্রেণি-বৈষম্য স্বীকার করা হলো না, কারণ প্রত্যেকেই অন্য সবার মত শ্রমিক ছাড়া আর কিছু নয়; কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির বিশেষ গুণের এবং তারই দরুন উৎপাদন-ক্ষমতার অসমতাকে স্বাভাবিক বিশেষ অধিকার হিসেবে মৌন-স্বীকৃতি দেয়া হলো। সুতরাং অন্য সব অধিকারের মতো এই অধিকারটিও অন্তর্বস্তুর দিক থেকে অসমানতার অধিকার মাত্র। অধিকারের প্রকৃতিই এই যে, কেবল একটি সমান মানদণ্ড প্রয়োগের মাধ্যমেই তা সম্ভব। কিন্তু বিভিন্ন অসমান ব্যক্তির (আর অসমান না হলে তো বিভিন্ন ব্যক্তিই থাকত না) একটি সমান মানদণ্ডে তুলনা সম্ভব কেবল এই অর্থে যে, সমান দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের দেখা হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট দিকই কেবল ধরা হচ্ছে যেমন, বর্তমান ক্ষেত্রে, তাদের দেখা হচ্ছে কেবল শ্রমিক হিসেবে, আর কিছুই দেখা হলো না, বাকি সবকিছুই উপেক্ষা করা হলো। তাছাড়া, কোনো শ্রমিক বিবাহিত, কেউ নয়, একজনের চেয়ে আরেকজনের সন্তান সংখ্যা বেশি ইত্যাদি। সুতরাং, একই শ্রমসম্পন্ন করে এবং ফলে, সামাজিক ভোগ্য-ভাণ্ডারের সমান অংশ নিয়েও, কার্যত একজন আরেকজনের চেয়ে বেশি পাবে, একজন অপরের চেয়ে বেশি বিত্তবান হবে ইত্যাদি। এইসব ত্রুটি দূর করতে হলে অধিকারকে সমান

নয়, অসমানই হতে হবে। (*গোথা*, ১৭-১৮, র. স. ৩)

সমাজতন্ত্র তাহলে ব্যক্তিদের প্রাণহীনভাবে নির্বিচারে সমান করে ফেলা নয়, বরং তাদের মাঝের বিশেষ ব্যবধানকে সম্মান জানানো এবং প্রথমবারের মতো এই ব্যবধানগুলোকে তাদের মতো হয়ে ওঠার সুযোগ দেয়া। এইভাবে মার্কস ব্যক্তি ও সার্বিকের ধাঁধা সমাধান করেন। তাঁর মতে, সত্তা নিজের একলা ব্যক্তিদশা অতিক্রম করে গেলেই সে সার্বিক হয়ে যায় না। সার্বিকের মানে বরং প্রত্যেকের ব্যক্তিপরিচয়ের বাধাহীন মুক্ত প্রকাশের প্রক্রিয়া। তবে যতক্ষণ নারী-পুরুষকে তাঁদের শ্রম অনুযায়ী পারিতোষিক দেয়ার প্রয়োজন থাকবে, ততক্ষণ অনিবার্যভাবেই অসাম্যও বিরাজ করবে।

তবে সবচেয়ে বিকশিত সমাজ, মার্কস যাকে বলছেন কমিউনিজম, উৎপাদনশক্তিকে এমন প্রাচুর্যে বিকশিত করবে যে সাম্য আর অসাম্যের প্রশ্নই আর থাকবে না। তার বদলে নারী-পুরুষ তাঁদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যা প্রয়োজন তা নেবেন ব্যবহারযোগ্য সম্পদের ভাণ্ডার হতে:

> কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর স্তরে, শ্রমবিভাগের কাছে ব্যক্তির দাসোচিত বশ্যতার এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের বৈপরীত্যের যখন অবসান ঘটেছে; শ্রম যখন আর কেবল জীবনধারণের উপায় মাত্র নয়, বরং জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে; যখন ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-শক্তিও বেড়ে গেছে এবং সামাজিক সম্পদের সমস্ত উৎস অঝোরে বইছে—কেবল তখনই বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্তরেখাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করা সম্ভব হবে, সমাজ তার পতাকায় মুদ্রিত করতে

পারবে, প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্য অনুসারে, প্রত্যেকে পাবে তার প্রয়োজনমতো। (*গোথা*, ১৮, র. স. ৩)

কমিউনিস্ট সমাজে আমরা সমাজ-শ্রেণির জিদ হতে মুক্ত থাকব। এর বদলে থাকবে আমাদের ব্যক্তিত্বকে যেভাবে চাই কর্ষণ করার অবসর ও শক্তি। তবে ব্যক্তির এই বিকাশ অন্যদেরও একই কাজ করার সুযোগ থাকার অনুশাসনকে সম্মান জানাবে। উদারতাবাদের সঙ্গে এই রাজনৈতিক লক্ষ্যের স্পষ্ট ভিন্নতা আছে। যেহেতু মার্কসের মতে, আমাদের ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ একই সঙ্গে আমাদের প্রজাতি-সত্তার বাস্তবায়ন, তাই ব্যক্তিজীবনের এই অন্বেষণ ও প্রকাশের প্রক্রিয়া হবে জমকালো নিঃসঙ্গতার বদলে একে অপরের বন্ধনের মধ্য দিয়ে পারস্পরিকভাবে। আরেকটা তফাৎ মার্কস দেখেছেন। তাহলো আত্ম-পূর্ণতার উপায়। উদারতাবাদী সমাজে আত্ম-পূর্ণতা কী? খুব বেশি হলে তা ব্যক্তিদের পূর্ণতার নেহাৎ সহ-উদ্যোগী। খুব মন্দ হলে অন্যের আত্ম-বাস্তবায়ন আমার নিজ আত্ম-বাস্তবায়নের পথে সক্রিয় প্রতিবন্ধকতা। কমিউনিস্ট সমাজ পুঁজিবাদ তার হাতে যে উৎপাদনশক্তি অর্পণ করেছে তাকে বদলে দেবে। কমিউনিজমের লক্ষ্য থাকবে যথাসম্ভব সমস্ত অবমাননাকর শ্রম বিলোপ করা। এভাবে নারী-পুরুষকে হাড়ভাঙা মেহনতের নিপীড়ন থেকে সে মুক্তি দেবে। তারা তখন সমাজ জীবনের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে *যৌথ ব্যক্তি* হিসেবে অংশ নিতে পারবে এমন মানুষ হিসেবে যারা নিজের নিয়তি নিজেই নির্ধারণ করে। কমিউনিজমে নারী-পুরুষ তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে পারবে, নিজেদের সৃষ্টি করা জগত নিজের বলে চিনে নিতে পারবে। কৃত্রিমভাবে যে বলা হতো এই দুনিয়া বদলাবে না, সেই মিথ্যা তখন ঝেঁটিয়ে দূর করে ফেলা হবে।

তবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতিনিধি কে হবে? মার্কস একে আবিষ্কার করলেন সর্বহারার মাঝে। কেন সর্বহারা? এ জন্য নয় যে, তারা অন্য শ্রেণি হতে মরমিভাবে শ্রেষ্ঠ, অথবা এই কারণেও নয় যে তারা সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত সমাজ শ্রেণি। দ্বিতীয়টা হলে তো ভবঘুরে, সমাজচ্যুত ব্যক্তি, সর্বস্বান্তরাই (মার্কস যাদের বলেন *লুম্পেন সর্বহারা*) সবচেয়ে ভালো কাজে লাগত। এমন দাবিও করা যায় যে, সমাজতন্ত্র নয়, পুঁজিবাদ নিজেই শ্রমিক শ্রেণিকে বিপ্লবী পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছে। পুঁজিবাদ উচ্ছেদ হলে এই শ্রেণিই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে। এরাই তো সেই উচ্ছেদের কাজ করার জন্য যথেষ্ট দক্ষ, সংগঠিত এবং এদের অবস্থান পুঁজিবাদেও একেবারে কেন্দ্রে। তবে শ্রমিক শ্রেণির দায়িত্ব হলো এক বিশেষ বিপ্লব সম্পন্ন করা। এই বিপ্লব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। আর সেই কাজে কোনো অর্থেই অন্যান্য র‍্যাডিকেল গ্রুপগুলোর (যেমন নারীবাদী বা জাতীয়তাবাদী বা নৃগোষ্ঠীগত আন্দোলনের কর্মী) সঙ্গে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। এই গ্রুপগুলোকে অবশ্যই তাদের নিজ রূপান্তর পুঁজিবাদের হাতে সবচেয়ে বেশি শোষিতদের সঙ্গে মিত্রতার মাধ্যমেই সম্পন্ন করতে হবে।

ভবিষ্যতের সেই সমাজ কোন রূপ নেবে? নিশ্চয়ই তা রাষ্ট্রপরিচালিত সমাজব্যবস্থা হবে না। মার্কসের কাছে রাজনৈতিক রাষ্ট্র সমাজের নিয়ন্ত্রক *উপরিকাঠামো*। রাষ্ট্র শ্রেণি সংগ্রামের সংঘাতের উর্ধ্বে নয়, সংঘাতের কোনো সমাধানও নয়। রাষ্ট্র তো নিজেই শ্রেণি সংঘাতের মাঝ হতে জন্ম নিয়েছে। রাষ্ট্র চূড়ান্ত বিচারে শাসক শ্রেণির হাতিয়ার, অপর শ্রেণির ওপর তার আধিপত্য নিশ্চিত করার উপায়। বিশেষ করে বুর্জোয়া রাষ্ট্র বেড়ে ওঠে ব্যক্তি ও সার্বিক জীবনের বিচ্ছিন্নতার মাঝ হতে:

> ব্যক্তি-মানুষ আর সম্প্রদায়ের স্বার্থের মধ্যকার ঠিক এই দ্বন্দ্ব থেকেই সম্প্রদায়টা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে রাষ্ট্র হিসেবে, যেটা ব্যক্তি-মানুষ আর সম্প্রদায়ের আসল স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন, আর যেমন রাষ্ট্র হিসেবে, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিভ্রান্তিকর সাধারণী জীবন হিসেবে, তবু সব সময়েই সেটার ভিত্তি হলো প্রত্যেকটা পরিবারে আর গোষ্ঠীগত সমবায়ে বিদ্যমান বিভিন্ন বন্ধন যেমন, জ্ঞাতিত্ব, ভাষা, বৃহত্তর পরিসরে শ্রমবিভাগ এবং অন্যান্য স্বার্থ, আর, যা আমরা পরে বিশদভাবে দেখাব, সেটার ভিত্তি হলো বিশেষত বিভিন্ন শ্রেণি, যা ইতঃপূর্বে শ্রেণিবিভাগ দিয়ে নির্ধারিত হয়ে যায়, এমন প্রতিটি জনরাশিতে এসব শ্রেণি পৃথক হয়ে যায়, এবং সেগুলোর মধ্যে একটা অন্য সবগুলোর ওপর আধিপত্য করে। এর ফলস্বরূপ এটা আসে যে, রাষ্ট্রের ভিতরে সমস্ত সংগ্রাম-গণতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র আর রাজতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম, ইত্যাদি হলো বিভিন্ন শ্রেণি পরস্পরের মধ্যে নিস্পত্তি অবধি যেসব সংগ্রাম চালায় সেগুলোর নিছক বিভ্রান্তিকর আকার। (*ভাবাদর্শ* পৃ. ৪০)

মার্কস শ্রেণি সংগ্রাম নিয়ে তাঁর বিশদ আলোচনায় রাষ্ট্র নিয়ে সব সময় এমন প্রাণবন্ত মত দেননি। তবে এই ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত যে, রাষ্ট্র বিষয়ে সত্যটা রাষ্ট্রের বাইরে নিহিত, আর তদুপরি, সে নিজেই বিচ্ছিন্নতার এক ধরন। প্রত্যেক ব্যক্তি-নাগরিকের ব্যক্তি-ক্ষমতার অংশ রাষ্ট্রের কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা তখন প্রতিদিনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের ওপরে এক নির্ধারক শক্তির রূপ ধারণ করে, মার্কস যাকে বলেন *সিভিল সমাজ*। এর বিপরীতে, খাঁটি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র আমাদের সাধারণ ও ব্যক্তি অংশকে আবার যুক্ত করবে, ধরা-ছোঁয়া যায় এমন ব্যক্তি হিসেবে

সাধারণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগের মাধ্যমে। সেই অংশগ্রহণ হবে, উদাহরণ হিসেবে বলে যায়, কাজের জায়গায় বা স্থানীয় কমিউনিটিতে। এর সাথে আজকের একেবারে বিমূর্ত নাগরিকদের উদার প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের তফাৎ আছে। মার্কসের চূড়ান্ত স্বপ্ন এইভাবে কিছুটা নৈরাজ্যবাদী মনে হতে পারে: শ্রমিকদের *স্বাধীন সংঘের* সমন্বয়ে সমবায়ী সাধারণতন্ত্র (commonwealth) গড়ে ওঠা, যারা গণতন্ত্রকে অর্থনৈতিক বলয়ে বিস্তৃত করবে রাজনৈতিক বলয়ে সেই গণতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করার সংগে সংগে। এই উদ্দেশ্য খুব অলক্ষুণে বা ভীতিকর নিশ্চয়ই নয়। মার্কস এই উদ্দেশ্যেই শুধু তাঁর লেখা নয়, জীবনের বড় অংশটা নিবেদন করে গেছেন।

উদ্ধৃতির অনুবাদের উৎস

এই গ্রন্থে উল্লেখিত মার্কসের রচনাগুলোর নাম নিচে দেয়া হলো, বন্ধনীতে দেয়া নাম মূল রচনার সংক্ষেপ হিসেবে এই অনুবাদে ব্যবহৃত হয়েছে।

হেগেলের অধিকার দর্শনের পর্যালোচনা (অধিকার)
ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোজফিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট ১৮৪৪ (১৮৪৪)
পবিত্র পরিবার (পরিবার)
জার্মান ভাবাদর্শ (ভাবাদর্শ)
কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার (ইশতেহার)
ক্যাপিটাল (ক্যাপিটাল)
গ্রুন্ড্রিসে (গ্রুন্ড্রিসে)
লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার (বোনাপার্ট)
পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক ঝোঁক (ঐতিহাসিক ঝোঁক)
অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থের ভূমিকা (ভূমিকা)
জনগণের সংবাদপত্রের বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা (সংবাদপত্র)
গোথা কর্মসূচির পর্যালোচনা (গোথা)

মার্কসের উদ্ধৃতির অনূবাদের উৎস নিচে দেয়া হলো। যেসব উদ্ধৃতির অনুবাদ উৎস সংক্ষেপ দেয়া নেই, সেগুলো এই সংস্করণের জন্য অনুবাদককৃত।

১. *১৮৪৪ - ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোজফিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট ১৮৪৪*, অনুবাদ জাভেদ হুসেন, বাংলায়ন, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০ ঢাকা হতে নেয়া, এই বইয়ের জন্য অনুবাদ প্রায়শ পরিমার্জন করা হয়েছে।
২. *ভাবাদর্শ* - ১৯৭৯ সালের মস্কো হতে বারো খণ্ডে প্রকাশিত মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলির প্রথম খণ্ড হতে
৩. *র. স.* - *কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০
৪. *ক্যাপিটাল*, খণ্ড ১ মস্কো, ১৯৮৮, সংস্করণ হতে খণ্ড ৩ (বাংলা খণ্ড ৬), বাণী প্রকাশ, অনূবাদ পীযুষ দাশগুপ্ত, কলকাতা, ১৩৬৫